চতুর্থ অধ্যায়

উনিশ শতকের বাংলা নাটকে বিধবা নারীর সংকট

সতীপ্রথা চালু থাকার সময়কালে যুবতী বিধবার সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয়নি। কারণ স্বামীর মরণের সঙ্গে সঙ্গে বিধবা নারীকে চিতার যূপকাষ্ঠে পুড়িয়ে মারা হত। এই ঘৃণ্য প্রথা যখন রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় বন্ধ হল তখন সমাজে যুবতী হিন্দু বিধবার সংখ্যা দিন দিন বেড়ে গেল। যুবতী বিধবা রমণী যৌবন ক্ষুধার তাড়নায় ও প্রবল দুর্বার রিপু বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বাধ্য হল গোপনে যৌন মিলনে। সমাজে দেখা দিল ভ্রূণ হত্যার একাধিক অবাঞ্ছিত ঘটনা। দেখা দিল, নাবালিকা বিধবার সম্পত্তি হাতিয়ে নেবার নানান ষড়যন্ত্র। বিধবা কিশোরী উপবাস আর অর্ধাহার, সাদা থান পরিধান করে যৌবনে যোগিনী হতে বাধ্য হল। সমাজে দেখা দিল নানান অপরাধ প্রবণতা।

মহামারীর রূপ নিয়ে সমাজে দেখা দিল ভ্রূণ হত্যা, অবৈধ গর্ভপাত, অবৈধ প্রণয়, বেশ্যাবৃত্তি। গ্রামের বঞ্চিত যুবতী বিধবারা জীবন বাঁচানোর তাগিদে নতুন গড়ে ওঠা শহর কলকাতার রাজপথে দেহব্যবসায়িনী পণ্যজীবী হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিল। বাধ্য হয়েছিল, বাবুদের রক্ষিতা হয়ে জীবন কাটাতে। বিধবা নারীর এই সংকটাপন্ন রূপ সেকালের সাহিত্যিকেরা তাঁদের সাহিত্যে তুলে ধরলেন মরমী দৃষ্টিকোণ থেকে। উনিশ শতকের সমকালে বাংলা সামাজিক নাটক রচনা করতে গিয়ে নাট্যকারেরা কাহিনীর পরতে পরতে 'বিধবা চরিত্র'কে, তাঁদের সংকটকে নাটকে তুলে আনলেন। ভিন্ন বয়সের বিধবা ভিন্ন সমস্যা, ভিন্ন সংকটের টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত বিধবা নারী চরিত্রকে, নারীর দুঃখকথাকে নাট্যকারেরা প্রকাশ্যে আনলেন।

উনিশ শতকের বিধবা নারীদের সংকট বহুধায় বিস্তৃত। বিধবা নারীরা কখনো বা গৃহকর্মে আচারনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণ ঈশ্বর সেবায় নিয়োজিত প্রাণ, কখনো বা পুনঃ ঘর বাঁধার স্বপ্নে গৃহত্যাগী এবং তার জন্য চৌর্যবৃত্তির আশ্রয়, কখনো বা পরকীয়ায় সুখের অনুসন্ধানী, কখনো বাঁচার তাগিতে বেশ্যা বৃত্তিতে গমন, কখনো বা অবৈধ কর্মে লিপ্ত হয়ে ভ্রূণ হত্যায় পাপ কর্মে নিয়োজত, কখনো

বা বিধবা বিবাহের জন্য সততঃ উন্মুখ। পিতৃগৃহ ও শ্বশুরগৃহে বিধবাদের সংকটের ভিন্ন প্রতিচ্ছবি চোখে পড়ে। এমনকি অর্থনৈতিক ভাবে বলীয়ান ও অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব অসহায় বিধবার শ্রেণী চরিত্র ও তাদের মনস্তত্বকে তুলে ধরতে সচষ্টে হয়েছি। বস্তুত উনিশ শতকের একাধিক নাটকের কাহিনী বৃত্তে আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করবো বিধবা নারীদের এই শ্রেণী বৈচিত্র্য ও সংকটের ভিন্ন রূপ।

১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃত হবার পূর্বে রামনারায়ণ তর্করত্নের *'কুলীন কুলসর্বস্ব'* (১৮৫৪) নাটকে বিধবার মর্মযন্ত্রণার কথা উপস্থাপিত হয়। সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক মনস্ক বিদ্বৎসমাজের একাংশ সমাজ সংশোধনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তেমনই এক বিদ্যোৎসাহী জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী কৌলীন্য প্রথার কুফল বিষয়ক নাটক রচনার জন্য ১৮৫৩ সালে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় পুরস্কার ঘোষণা করে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। এই তাগিদ থেকেই নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনা করেন *'কুলীন কুলসর্বস্ব'* নাটক (১৮৫৪) এবং পুরস্কৃত হন।

'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকে কুলীন কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চার কন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে মূল কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। ঘটক অনিতাচার্য ও শুভাচার্য কুলপালকের চার কন্যার বিবাহের জন্য একটি কুলীন পাত্র ঠিক করেন। পাত্রের পরিচয় দিয়ে অনৃতাচার্য জানিয়েছে, —*"বরের কিঞ্চিৎ বয়োধিক্য, আর এমন অধিক বয়সই বা কি? সেই যষ্ঠির বৎস এই যষ্টিবৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। যাহা হউক, তোমার কি অদৃষ্ট, শিবের জামাই শিব ঘটিয়াছে অতএব তুমি সেই সর্বগুণালঙ্কৃত কুলীন মহারথী কুমারে কুমারী প্রদান করিয়া চরিতার্থ হও।"*[১] সমাজ অনুশাসনকে মান্যতা দিতেই কুলপালক এমন অশীতিপর বৃদ্ধের সঙ্গে নিজ কন্যাদের বিবাহ দিতে একরকম বাধ্য হয়েছেন। এ বিবাহ আগাম বৈধব্য যাত্রার নামান্তর মাত্র। সেকালে হিন্দু নারীর এমনই অবস্থা ছিল যে, কুমারীত্ব, বিবাহিত ও বৈধব্য জীবনাচরণ সমাজের যূপকাষ্ঠে পীড়িত। অনৃতাচার্যের বক্তব্যে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবস্থানগত সংকটটি প্রকাশিত হয়েছে, —*"শুনিয়াছি সপ্তশলাকে বিবাহ হইলে স্ত্রী বিধবা হয়, কিন্তু কুলীন কুমারীরা ত সর্বদাই বৈধব্য-বেদনা সহ্য করে, সুতরাং বিধবার আর বৈধব্যের আশঙ্কা কি? অতএব, ইহাকে বাক্‌ছলে প্রতারিত করে স্বকার্য সাধন করি।"*[২]

কুলপালক তাঁর চার কন্যাকে বিবাহের কথা জানালে বয়স অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। চার কন্যার বয়স যথাক্রমে ৩২, ২৬, ১৫ ও ৮। বিবাহ বিষয়ে কুলপালকের

চার কন্যার মধ্যে চার ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বড় কন্যা জাহ্নবীর মনে আনন্দ নেই। জাহ্নবী জানিয়েছে,—"*আমার কি আর 'বের' সময় আছে? আমি অন্তদন্ত হীন হয়েছি, এখন 'তীর্থে' যাওয়াই উচিত।*"[৩] মেজ কন্যা শান্তবী বিবাহ সম্পর্কে কিছুটা অনুরাগী। সে জানিয়েছে, —"*ক্ষতি কি? হলোই বা।*"[৪] সেজ কন্যা কামিনী যৌবন জ্বালায় পীড়িত। কিশোরী বালিকাসুলভ চপলতায় জিজ্ঞাসুপ্রবণ। কিশোরী আগত বৃদ্ধ বরের বর্ণনায় জানিয়েছে,—

"*দেখিলাম বাসায় বসিয়া আছে বর।*
প্রবীণ বয়স শীর্ণ জীর্ণ কলেবর।।

.....

সিদ্ধিতে নাহয় সিদ্ধি আকিঞ্চন গাঁজা।
ঢুলু ঢুলু আঁখি মুখে উঠিতেছে গাঁজা।।
শূল ধরে সে বাতুল কপালে আগুন।
গুণের মধ্যেতে তার আছে তমোগুণ।।
গঙ্গাকে ধরিয়া শাদা হয়েছে কি কেশ।
এ বর দিগম্বর খেপা ব্যোমকেশ।।
তামাক টানিয়া মরে কাশিতে২।।
বোধ হয় গয়া এবার কাশিতে।।
মরণ পোঁড়ার মুখো কেনবা এসেছে।
চিত্রগুপ্ত বুঝি খাতা ভুলিয়া বসেছে।"[৫]

কুলপালকের জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহ্নবী তাঁর বোধবুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে এমন বরকে বিবাহ করা মানে বৈধব্যের নামান্তর। আক্ষেপের সঙ্গে জাহ্নবী জানিয়েছে,—"*এ বিয়া হইলে মাত্র একাদশী ফল।*"[৬] এর পাশাপাশি নাট্যকার, ফুলকুমারী নামক এক কিশোরী নববধূর যন্ত্রণাকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। ফুলকুমারী তাঁর যশোদা ঠাকুমাকে জানিয়েছে,—

"*টাকা হাতে করি কাকা গিয়ে তাকে দিল।*
এমনি কুলের ধর্ম্ম তবে পা ধুয়িল।।

.....

যামিনীতে একাকিনী শয়ন করিয়া।
পতির ধ্যানেতে আছি নয়ন মুদিয়া।।

.....

দেখিয়া নিদ্রিতা মোরে পাষণ্ড পামর।

অনায়াসে ঢ্যাকামেরে জাগায় সত্বর।।

.....

শীঘ্র করি অর্থ মোর হাতে দেও আনি।

নতুবা অনর্থ হবে বুঝ অনুমানি।।

.....

কাট্‌নাকাটা কড়ি যত করিনু বাহির।।

যা ছিল আমার পুঁজি দিলাম সকল।

তথাপি অধিক দেও কহিল পাগল।।

তাতে কহিলাম নাথ তুমি জ্ঞানবান।

কেন কর অধীনীরে এত অপমান।।।

কহ দেখি কোথা আছে বিধান এমন।

পত্নীর নিকটে পতি লইবে বেতন।।

ইহা শুনি গুণমণি ক্রোধেতে মহেশ।

নারী হয়ে মোরে তুমি দেও উপদেশ।।

এত বলি ক্রোধ ভরি উঠিয়া চলিল।..."[৭]

ফুলকুমারী চরিত্রটির বাস্তব ভিত্তি আছে। ফুলকুমারীর দাম্পত্য জীবন মর্মস্পর্শী। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন ব্যক্তিগত জীবনে কামিনী নামক এক কুলীন কন্যার অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনায় বড় ধরণের আঘাত পেয়েছিলেন । সেই কামিনী এ নাটকে ফুলকুমারীর রূপে চিত্রিত হয়েছে। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'বাঙ্গালা নাটকের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে লিখেছেন,—''*তিনি যখন পূর্ব্ববাঙ্গালায় এক চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন, সেই বাটিতে কামিনী নাম্নী একটি রূপবতী কুলীন কন্যা ছিল। তাহার স্বামী অনেকগুলি বিবাহ করে। একদিন শ্বশুর বাড়ী আসিয়া রাত্রিতে স্ত্রীকে শয়ান অবস্থায় দেখিয়া কর্কশস্বরে তাহাকে বলে "আমায় অর্থদ্বারা পূজা না করিয়া শয়ন করিয়া আছিস? আমি কত বড় কুলীন ছেলে জানিস? আগে আমার মর্য্যাদার টাকা আন্, পরে নিদ্রা যাস।''* কামিনী উত্তর করে "*আমার তো কিছুই নাই, তুমি আমাকে টাকা না দিলে আমি টাকা কোথায় পাইব?''* ইহাতে স্বামী আরও উত্তেজিত হইয়া বলে "*কি আবার তর্ক? আমার*

যেখানে পূজা নাই, সেখানে আমি একবিন্দু কাল থাকি না'' বলিয়া চলিয়া যায়। ইহার পরে সে আর শ্বশুর বাড়ী আসে নাই। ইহার কিছুদিন পরে কামিনী উদ্বন্ধনে নিজের জীবনলীলা সাঙ্গ করে।"[৮]

সেকালে কুলীন ব্রাহ্মণেরা বিবাহ দ্বারা নিজেদের অর্থলিপ্সাকে চরিতার্থ করত। এছাড়া এই অংশে ধরা পড়েছে সমকালীন কুলীন কন্যার বিবাহিত জীবনের দুর্দশার ছবি। অনতিকাল পরেই ঘটত অকাল বৈধব্যের ঘটনা। ফলত হিন্দুনারীর জীবন অতিবাহিত হত কৃচ্ছ্রসাধনের অসারতার মধ্যে। যশোদা কৌলিন্যপ্রথাকে দোষারোপ করে বলেছে,—''*হ্যাঁরে বল্লাল, তুই কাল হয়ে এসেছিলি? কে তোকে কুলের সৃষ্টি কত্যে বলেছিল? কুলতো নয় এ কুলের আঁটি—বড় কঠিন! যার কুল আছে তার কি দয়া নেই? ধম্ম নেই?*"[৯]

দীর্ঘদিন স্বামীর অনুপস্থিতিতে, লোক পরম্পরায় সধবা নারীকে বিধবা নারীর দৃষ্টিতে দেখা হত। উত্তমের মায়ের চরিত্রে এমনই এক নারীর চিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকার। বিবাহবণিকের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে উত্তমের মা বৈধব্য বেশ ধারণ করে বৈধব্য জীবন অতিবাহিত করেছে। উত্তম জানতে পেরেছে এ সংবাদ মিথ্যা। তাই সে পিতাকে গৃহে নিয়ে যেতে চায়। উত্তম জানিয়েছে,—''*মহাশয়, আজি তিন বৎসর হইল আমরা মহাশয়ের শরীরের অমঙ্গল সংবাদ পেয়েছিলাম, এখন বুঝিলাম সে সম্বাদ মিথ্যা; কিন্তু তাহাতেই আমার মাতৃঠাকুরাণী বিধবা হইয়াছেন। অদ্য আপনকার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, পরম সৌভাগ্যের বিষয়, আমি এই সম্বাদ বাটীর সকলকে জানাইলে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না, তাই মহাশয়কে এতো আকিঞ্চন করিয়া লইয়া যাইতেছি;—তাঁহারাও তুষ্ট হইবেন, মাতৃ ঠাকুরাণীর বৈধব্য দূর হইবে।*''[১০] সেকালে কৌলিন্য প্রথা চালু থাকার ফলে কুলীন ব্রাহ্মণেরা একাধিক বিবাহ করতেন। শ্বশুর যদি দরিদ্র হতেন তাহলে শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে জামাইটি তার সব সম্পর্ক ছিন্ন করতেন। দৈবাৎ বিপাকে পড়লে শ্বশুর গৃহের দ্বারস্থ হতেন এইসব কুলীন ব্রাহ্মণেরা । সংকটে পড়ে নিষ্পাপ কিশোরী বিবাহিত রমণীরা দীর্ঘ দিন স্বামী অদর্শনের পর বৈধব্য জীবনকেই আঁকড়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য হতেন। বিবাহবণিক তাঁর প্রবল কৌলিন্য জাত্যাভিমানকে সগর্বে ঘোষণা করে স্বগত ভাষণে জানিয়েছে,—'' *স্বামী স্ত্রীর সকলই দেখিতে পায়, কিন্ত বৈধব্যদশা কদাচ দর্শন করিতে পায় না, দেখ আমি কি ভাগ্যবান্ তাহাও স্বচক্ষে দেখিব,—হা অদৃষ্ট!*"[১১]

এ নাটকে নারীর অসহায়তার বিচিত্র রূপ তুলে ধরেছেন নাট্যকার। কুলপালকের চার কন্যার বিবাহ হয়েছে এক বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে। অন্যদিকে চন্দ্রমুখী স্বামীকে টাকা না দিতে

পারার কারণে তাঁর স্বামী উদাসীন থেকেছেন। যমুনা স্বামীসুখ বঞ্চিত হয়ে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হবার বাসনায় উন্মুখ থেকেছে, হেমলতা বিষ খেয়ে আত্মহত্যার কথা ভেবেছে। যশোদা জানিয়েছে, সে বিবাহের রাত্রে পাঁচ ভগিনী মিলে বিধবা হয়েছে। ফুলকুমারী স্বামীর কাছ হতে পেয়েছে শুধুমাত্র অবহেলা ও অনাদর। কৌলীন্য প্রথা চালু থাকার ফলে অনেক সময় দেখা গেছে এক লগ্নে অশীতিপর কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে দুই, তিন, পাঁচ ও তার অধিক কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। এবং বিবাহের অল্পকালেই কুলীন বরের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হওয়ার ফলে সকলেই বৈধব্যের দশায় উপনীত হয়েছে। নাট্যকার কৌলিন্য প্রথার দোষ দেখাতে গিয়ে কার্যকারণ সূত্রে বিধবার সংকট চিত্রকেও তুলে ধরেছেন *'কুলীন কুলসর্বস্ব'* নাটকে।

উমেশচন্দ্র মিত্রের *'বিধবা বিবাহ নাটকে'র* (১৮৫৬) কাহিনী গড়ে উঠেছে সুলোচনা নামক এক কিশোরী বিধবার করুণ কাহিনী অবলম্বনে। পাশাপাশি সমবয়সী দুই বিধবা ও সধবা নারীর চিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়েও বৈপরীত্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিধবা নারীর সংকট ও মনোযন্ত্রণাকে রূপ দিয়েছেন নাট্যকার। সুখময়ী বিধবা (রাঁঢ়) আর, বিদ্যুল্লতা সধবা মেয়েমানুষ। সুখময়ীর খাওয়া পরার কোনো অভাব নেই। কিন্তু তার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ তার স্বামী নেই। সুখময়ীর সবকিছু থাকা সত্ত্বেও সে নিঃস্ব। বসন্ত এলে তার প্রাণে নিঃসঙ্গতা জাগে। সরল বিদ্যুল্লতা তা বুঝতে পারে না। সুখময়ী অক্লেশে জানিয়েছে,—*"না, আমরা আর মানুষ নই, যে দিন বিধবা হয়েছি সেই দিন মনুষ্যত্ব গিয়ে দেবত্ব হয়েছে, আর চাট্টে হাত পা বেরিয়েছে। আমাদের কি কিছু বোধ হয়? একেবারে স্পন্দরহিত হয়েছি।"*[১২] নাট্যকার এই অংশে নারী চরিত্রের শ্রেণী নির্মাণ করেছেন—বিধবা ও সধবা। বিবাহিত নারী বৈধব্যে পরিণত হলে মুহূর্তেই সে সমাজ অনুশাসনে কৃচ্ছ্রসাধনে নিমজ্জিত হয়। নারী অন্তঃপুরে সেকালে এই বিভেদ ছিল, নাট্যকার তা অসামান্য ভাবে তুলে ধরেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বিধবাদের যন্ত্রণার অবসান হয় খানিক পরিমাণে। দ্বিধাবিভক্ত সমাজের কিছু কিছু সধবা ও বিধবা মহিলারাও এর প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। 'বিধবা বিবাহ' শাস্ত্রসম্মত জেনেও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন নিয়ে পাপের অংশীদারিত্বের কথা ভেবে নারী মহল হতে দ্বিতীয় বিবাহে সম্মতি আসেনি। উমেশচন্দ্র মিত্রের *'বিধবা বিবাহ নাটক'*টির মধ্যে সমাজের এই জটিল মানসিকতার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। কখন কখন বিধবারাই বিধবা বিবাহের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে শুরু হয় আলোড়ন,

গুঞ্জন। মুখে মুখে ফেরে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মনের মধ্যে শুরু হয় আশা, প্রত্যাশা—নতুন করে বাঁচবার স্বপ্ন। এর পাশাপাশি চলে ধর্মীয় ভীতি প্রদর্শন, ও কঠিন নিন্দা। পদ্মাবতীর কথায় ফুটে উঠেছে সমাজের দুটি দলের অস্তিত্ব। পদ্মাবতীর ধারণা ভাল মানুষের ঘরের মেয়েরা বিধবা হলে তাদের পুনর্বিবাহ হয় না,—"*ভাল মানুষের ঘরে কি কখন বিধবার বে হতে পারে, একথা বলতে লজ্জা করে, একি কখন হয়।*"[১৩] কিন্তু বিধবা সুলোচনার তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সুলোচনা প্রতিবাদে সক্ষম। সে মায়ের মুখের ওপর সত্যি কথা বলে ফেলে,—"*বাবা যেমন পাঁচটার পর তোকে বে করেছেন, আবার তুই যদি কাল মরিস তবে কাল অমনি আর একটি হবে।*"[১৪] সুলোচনা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দিকে কটাক্ষ করে নিজের পিতাকে তিরস্কার করেছে। পুরুষেরা যদি একাধিক বিবাহ করে সংসার করতে পারে, সেক্ষেত্রে নারীরা কেন বঞ্চিত।

অল্প বয়সে সুলোচনার বিয়ে হয়। কিছুকাল পরেই তার স্বামী বিয়োগ ঘটে। সে সময় সুলোচনা ধূলো খেলায় মত্ত তাই পতিবিয়োগ কি জিনিস, সে বোঝেনি। সহবাস কি জিনিস তা জানতে পারেনি। শৈশবসুলভ চপলতায় তার দিন কেটেছে। কিন্তু যখন যৌবনে সে পা দিয়েছে, বৈধব্য জ্বালা তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। বুঝতে শিখেছে বিরহ জ্বালা। ধর্ম কর্মে তার মন আর থাকতে চাইছে না। অন্তরের জ্বালা মিটতে চাইছে না। একই শয্যায় তাকে রাত-দিন থাকতে হয়। তাই সে বলেছে, যদি ধর্ম নষ্ট হয় তাতে তার আর দোষ কোথায়। বিধবা সুলোচনা রামকান্ত বোসের ছেলে মন্মথের প্রতি প্রথম দর্শনে অনুরাগী হয়েছে। সেকালে, বিধবা মেয়েরা কোন সময়ই কোনো পরপুরুষের সামনে আসত না। বাড়ীর বড়রা পুরুষদের সাক্ষাৎ থেকে দূরে রাখত। কারণ পুরুষের সান্নিধ্যে কিশোরী বিধবাদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে, পদস্খলন হতে পারে। রামকান্ত বোসের ছেলেকে কাছ থেকে দেখায় সুলোচনার মধ্যে চিত্তচঞ্চলতা তৈরি হয়েছে। নাপেতানী রসবতীর কাছে সুলোচনা তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করে জানিয়েছে,—

"*মুখ ছাঁদে ফাঁদিয়াছে কি কটাক্ষ ফাঁদ।*
দিনরাত্রি হেরিলেও না ফুরায় সাধ।।
থাক মেনে কুলমানে কাজ নাই আর।
মন সাধে শোধি গিয়ে বিরহের ধার।।"[১৫]

মন্মথকে দেখে সুলোচনার বৈধব্য জীবনে নতুন পুলক সঞ্চার হয়েছে। ক্রমশ সুলোচনা পুরুষের সান্নিধ্য কামনায় অধীর হয়ে পড়েছে। স্বপ্নে সহবাস করার চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়েছে। সুলোচনার

এই চিত্তচাঞ্চল্য বাস্তবসম্মত। যে নারী কোন দিন স্বামী সুখ পায়নি, যৌবন কালে উপস্থিত হয়ে তার পক্ষে ব্যভিচারিণী হওয়াটা স্বাভাবিক। যৌবন ক্রমশ তাকে পুরুষের প্রতি আসক্ত হতে বাধ্য করেছে। নানান আচার অনুষ্ঠান তার মনের যৌবন যন্ত্রণাকে দমন করতে পারেনি। ক্রমশই স্বামী সুখ বঞ্চিতা বিধবা বালিকা সুলোচনা যৌবনে পদার্পণ করেই স্বামীসুখ পাবার লিপ্সায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সামাজিক নিয়ম নীতির বেড়াজালে তাই সে পরপুরুষ কাঙ্ক্ষিণী হয়ে উঠেছে। বৈধব্য আচার, নিয়ম সে ভেঙে ফেলেছে। এক মুহূর্ত প্রেমিকের পরশ লাভের জন্য সুলোচনা ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।

মন্মথ সুলোচনার প্রণয়ী। মন্মথ শিক্ষিত ও বিধবা নারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। মন্মথ তাঁর সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বুঝতে পারে বিধবা হবার যন্ত্রণা। সে বুঝতে পারে, একজন বালিকাকে যখন যাবজ্জীবনের জন্য অন্য কারোর হাতে তুলে দেওয়া হয় তখন সেই বালিকা বুঝতেই পারে না যে, বিবাহ কি জিনিস এবং স্বামী কাকে বলে। আর যখন বুঝতে পারে তখন সে স্বামীহীনা সমত্ত যৌবনা। বিধবা হবার করুণ সামাজিক পরিকাঠামোর ঘেরাটোপে সে শুধুমাত্র উপোস করে পূজা-অর্চনা করে এবং পারিবারিক সুখ ভোগ ও সমস্ত আড়ম্বর ও জাঁকজমক থেকে দূরে থাকে। পুরুষের সান্নিধ্যের বাইরে রাখার চেষ্টায় থাকেন বিধবা কন্যার পিতা-মাতা। একাদশী, উপোস এবং সাদা থানে তাদের জীবন হয়ে ওঠে গতানুগতিক। মন্মথ বিধবাদের এই দুর্দশা দেখে আক্ষেপের সঙ্গে বলেছে,—"*হা! নিষ্ঠুর দেশের কি দুর্নীতি! সৎকালীন বিবাহ হলো—সৎকালীন আপন অদৃষ্টকে যাবজ্জীবন জন্য একজনের হস্তে সমর্পণ করিল, তখন বিবাহ কাহাকে বলে কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিল না, বিবাহ হল এইমাত্র জেনে যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। হা! জগদীশ্বর কি ভারতরাজ্যের রমণীদিগের প্রতি এমত দয়াশূন্য হয়েছেন? তাদের যন্ত্রণার কি আর শেষ হবে না?*"[১৬] বস্তুত এ প্রশ্ন শুধু মন্মথর মত প্রগতিশীল যুবকের মুখে নাট্যকার বসাতে পেরেছেন বাস্তব সময়ের নিরিখে; কারণ এ প্রশ্ন প্রথম তোলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। তাঁর ভাবনাই এ নাটকে রূপায়িত।

কীর্ত্তিরাম ঘোষের বাড়ির বাইরের পাঠশালায় উপস্থিত ছাত্রদের মধ্যে রামকান্ত জানায় তাঁর বিধবা দিদির বিয়ে। কিন্তু তার কথা কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি। কারণ বিধবার পুনর্বিবাহকে সবাই সন্দেহের চোখে দেখেছে। গুরুমশাই, যিনি শিক্ষা দাতা তিনিও বিধবা বিবাহের বিষয়টিকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই অদ্বৈত দত্তের কন্যার বিবাহের সমস্ত কথা শোনামাত্র গুরুমশায়ের প্রতিক্রিয়া,—[*কর্ণে হস্ত প্রদান করিয়া*] "*রাম রাম! একি! কথায় যা বলে কর্ত্তব্যে*

তাই হলো? বাবাজী মেয়েটীর বয়স কত?"[১৭] মেয়েটির বয়স ১৩ বৎসর। চার বছর আগে মেয়েটির বয়স ছিল ৯ বছর। মেয়েটি বুঝতেই পারেনি বিবাহ কি আর বৈধব্যই বা কি জিনিস। এই ১৩ বছরের মেয়েটির দ্বিতীয়বার বিবাহ দিয়ে পিতা অদ্বৈত মেয়েটির জীবনকে সুরক্ষিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু সমাজের কিছু শিক্ষিত লোকেরাই এই সুরক্ষিত ব্যবস্থাকে মানতে রাজী হয়নি, পাছে তাদের ধর্ম নষ্ট হয়, শাস্ত্র খর্ব হয় এই ভেবে। এ প্রসঙ্গে রসবতী সুলোচনাকে জানায় যে, দত্ত বাড়ীর প্রসন্ন নামক মেয়েটির বিয়ে। সুলোচনা আশ্চর্য হয়ে বলে, প্রসন্ন তো একবছর আগেই বিধবা হয়েছে। আবার যদি বিয়ে হয় তাহলে তো বিধবা বিবাহের সত্যিই প্রচলন হল। সুলোচনা এতে খুব উৎসাহী হয়ে পড়ে। রসবতী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জানিয়েছে এ কৌতুক রঙ্গের বিয়ে,—"*সে বড় কৌতুকের বিয়ে মাঠাকুরণ। মাজের পাড়ায় দত্তদের বাড়ীর প্রসন্নের বিয়ে হবে।...অদ্বৈত দত্তের মেয়ে, তার চারি বৎসর হলো বিয়ে হয়েছিল; পরে সে বৎসর বিধবা হয়েছে। সেই মেয়েটির এই পঁচিশে বিয়ে হবে। এ বিয়ে রঙ্গের বিয়ে নয়?*"[১৮] এই কৌতুকের বিয়ে প্রবীণা পদ্মাবতী মানতে পারেননি। এয়োস্ত্রী পদ্মাবতীর ধারণা বিধবা বিবাহ আইন পাশ হলেও সমাজে তার প্রচলন হবার নয়। পড়াশুনো শেখা মেয়েরাও এই সাহস দেখাতে পারে না।পদ্মাবতীর কাছে এ বিয়ে দেওয়ার চেয়ে পুরুত মশায়ের কলসী দড়ি নিয়ে মরে যাওয়াই শ্রেয়। পদ্মাবতীর ঘর পুণ্যের ঘর। যে ঘরে বিধবারা আচার নিয়ম নিষ্ঠা পালন করে, সে ঘরে যদি নিষ্ঠা ভঙ্গ হয়—পুনরায় বিবাহের জন্য উন্মুখ হয় তবে তাদের পুণ্য থাকবে না। তাই রসবতীকে পদ্মাবতী বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা করতে বারণ করেছে। সামাজিক নিয়কে ভীত সন্ত্রস্থ পদ্মাবতী তার বিধবা কন্যাদের পড়াশুনাও বন্ধ করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছে।

বস্তুত উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে বিধবারা পুনরায় নতুন জীবনের খোঁজ করলে তা হয় শাস্ত্র বিরুদ্ধ তথা পাপ কাজ। যাদের বাড়িতে পুনর্ব্বার বিবাহ হয় তারা অতি পাপী। সামান্য পড়াশুনা শিখেই এইসব দিকে মেয়েরা ঝুঁকেছে বলে বয়স্কা স্থানীয়দের ধারণা। তাই তাঁরা বিধবাদের পুণ্যবলে আটকানোর চেষ্টায় পড়াশুনো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতেও পিছু পা হন না।

উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধাচরণ যেমন সমাজের রক্ষণশীলরা করেছিলেন, সেই সঙ্গে সমাজের এক শ্রেণীর সংস্কার অন্ধ গৃহস্থ রমণীরা বিধবা বিবাহের ঘোরতর বিরোধিতা করেছিলেন। বিধবা বিবাহের বিরোধিতা প্রধানত অন্দরমহল হতেই নীরবে গুঞ্জরিত হয়েছিল, আর সেকারণে বিধবা বিবাহে তীব্র অনীহা তৈরি হয়েছিল মহিলা মহলে। বিধবা

বিবাহে মহিলারা সেভাবে এগিয়ে আসেনি, সেকারণে বিদ্যাসাগরের আন্দোলন সমকালে গতি পায়নি। উনিশ শতকের অন্তিমে স্ত্রীশিক্ষার বিকাশের পর এই সমাজ-মানসিকতার পরিবর্তন আসে অন্দরমহলে, নারীর স্বাধীন চিন্তা চেতনায়। বিধবা বিবাহের আইন হয়েছে জানতে পেরে বাড়ির বয়স্কা স্ত্রী সত্যভামা মন্তব্য করে—আইন হলেই কি বিয়ে করতে হবে নাকি।

ভারতবর্ষ যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ আইন' প্রণয়ণ নিয়ে তোলপাড় তখন বাড়ির স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাসাগরের এই আইন প্রণয়ন আন্দোলন নিয়ে ক্ষুণ্ণ, বিরোধিতায় মুখর। তারা বুঝতেই পারে না, যে বিধবা থাকার চেয়ে বিবাহ হওয়া কতটা সুখকর। তাদের ধারণা বিধবাদের বিবাহ হলে পাপ হবে। ধর্ম নষ্ট হবে। সত্যভামা মেয়েলি ঢঙে কটূক্তি করে জানিয়েছে,—

"উপস্থিত ঘোর কলি দোষ দিব কারে।
ডুবিল ভারত ভূমি পাপের সাগরে।।"[১৯]

অদ্বৈত দত্তের মেয়ের বিয়েতে সমাজের নানাশ্রেণীর লোকের উৎসাহের শেষ নেই। একটি বিধবা বিবাহের ঘটনা সমাজে সাড়া ফেলে দিয়েছে। রামদেব তর্কালঙ্কার বয়সে বৃদ্ধ ও রক্ষণশীল মনোভাবের। তিনি হরিহরের কাছ হতে বিধবা বিবাহের নেমন্তন্নের কথা শোনা মাত্র মন্তব্য করেছেন,—*"রাম! রাম! কি বল্লে, বিধবা কন্যার বিবাহ? ইহাও জীবিত থাকতে থাকতে দেখতে হলো যা শ্রবণ মাত্রেই ঘৃণার উদয় হয় সেই নিমন্ত্রণের কথা বলতেছ।"*[২০]

অদ্বৈত দত্তের অন্তঃপুর। প্রসন্নর বিয়ে হবে। বিধবা সুলোচনা খুব খুশী হয়। কারণ তাদের মত বিধবারা শুধুমাত্র একাদশী আর আতপ চালের ভাত খেয়ে জীবন কাটায়। সেই জীবন থেকে প্রসন্ন মুক্তি পাবে। সুলোচনা মনে মনে তার বৈধব্য জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বাস্তবে হয়ত তা সম্ভব হবে না জেনে কষ্ট পায়। সুলোচনার কথায় সামাজিক ঘেরাটোপটি সুস্পষ্ট। বিধবা বিবাহ যে বাড়িতে হয়, সমাজ তাদের 'একঘরে' করে রাখে। বিবাহ বাড়িতে ভাত খাওয়া হয় না। উনিশ শতকের বিধবা বিবাহকে নিয়ে নানান তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে সমাজ জীবন ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠেছিল। বিধবা বিবাহ যারা দিচ্ছিল, তাদের একঘরে করে দেওয়া, ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দেওয়া, স্পর্শচ্যুত করে দেওয়া ছিল এক ধরনের সামাজিক শাস্তি। সেকথাই নাট্যকার এই অংশে রূপ দিয়েছেন। বরযাত্রীদের একঘরে রাখা হয়। কিন্তু কেউ কখনই ভাবে না যে বিধবা মেয়েরা, যাদের জীবন দুঃখে পূর্ণ, তারা সারাটা জীবনে এই কষ্ট নিয়ে বাঁচবে কিভাবে। বিধবার দুঃখ যন্ত্রণা অপেক্ষা সমাজপতিদের কাছে নিয়মতন্ত্র অধিক

গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ বিধবারা সমাজের কাছে পরিত্যক্ত। সামাজিক স্বীকৃতি পুনরায় তারা ফিরে পাবার যোগ্য নয়। বিধবারা সামাজিক লাঞ্ছনার শিকার, তাদের গোপনীয় ভোগ্যবস্তু হতে বাধা নেই। তাদের নিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে ভোগ চলতে পারে কিন্তু পুনর্বার বিবাহ নয়।

যৌবনের কালপ্রবাহ সুলোচনাকে দগ্ধ করে। মন্মথের আগমন বার্তা পেয়ে সে মিলনের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে,—"*ছেলে বেলা বিধবা হয়েছি, কখনতো চুলের দিকে চেয়ে দেখিনে, আপনার শরীরের দিকে ফিরে দেখিনে, কেবল পশুর মত খেয়েছি আর ঘম্‌য়েছি, এখন আর্শিতে মুখ দেখে কেমন লজ্জা করছে...*"[২১]

সুলোচনা তার বৈধব্য যন্ত্রণাকে স্বীকার করে বলে,—"*এ দেশে বিধবা হওয়া কত পাপের ভোগ। দাসীবৃত্তি করে কাল্‌ কাটান, দিনান্তে অর্দ্ধাশন ভাল, ভিক্ষা করে প্রাণ ধারণ করা ভাল, এ দেশে বিধবা হওয়া ভাল নয়। ভেবে দেখ্‌ দেখি আমাদের বেঁচে থাকার ফল কি? পোড়া দেশের লোক এ দিকে শাস্ত্র দেখায়, যে স্ত্রীলোকের স্বামী আর নাই, কিন্তু যাদের স্বামী নাই তাদের যে কি গতি তা একবারও ভাবে না। কথায় কথায় স্বামী ধর্ম্ম দেখায়, ধর্ম্ম যে কিসে থাকে, তা দেখায় না।*"[২২] সুলোচনা ত্যগের পথ অতিক্রম করে ভোগের পথে পা বাড়ায়। বৈধব্য যন্ত্রণা ভুলে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে ওঠে। মন্মথের সঙ্গে মিলিত হয়।

গোপনে বিধবা মহিলাদের যৌনসঙ্গম ইত্যাদি বিষয়গুলি নাট্যকার তুলে ধরেছেন সুলোচনা মন্মথের প্রণয়ের মধ্য দিয়ে। তৎকালীন সময়ে অধিকাংশ অল্প বয়সী যৌবনবতী বিধবারা ব্যভিচারিণী হত। বিদ্যাসাগর এই সংকটকে বুঝেছিলেন দরদ দিয়ে। বিধবা হলেই, নারীর কোমল মন পাষাণ হয় না, কাম-রিপুর তাড়না থেকেই যায়। কিন্তু কীর্ত্তিরামের মতো মানুষেরা এ কথা স্বীকার করেও কাম-রিপুর সান্ত্বনার জন্য ধর্মকর্মে মন রাখার পরামর্শ দেন। সন্তান থাকলে তাদের প্রতিপালনে মনোনিবেশ করার কথা বলেন। তথাপি বিধবা বিবাহের সপক্ষে কোনো কথা বলেন না। তারা মনে করেন বিধবাদের বিবাহ হওয়া মানে অত্যন্ত গর্হিত কাজ, জাতে নামা ও সমাজ অধঃপতিত হওয়া। এ সমস্ত কার্য যারা করে থাকেন তারা সমাজের নিয়মে 'একঘরে'।

ক্রমে বিধবা সুলোচনা এর বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারে না। গর্ভধারণ সুলোচনার কাছে শারীরিক অস্বস্তি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। ক্রমে সুলোচনার গর্ভবতী হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে পরিবারের মধ্যে গুঞ্জরিত হয় নানা আক্ষেপ, নানা শঙ্কা। পদ্মাবতীর চিন্তা -তিনি যখন নিজের কন্যার সম্পর্কে এ কথা শুনবেন তখন ভদ্রলোকের গর্ব থাকবে কিনা। সুলোচনার মা পদ্মাবতী আশঙ্কিত হয়ে জানিয়েছেন,—"*...সকলে যে আমার বাড়ী খান্‌কির বাড়ী বলবে তা*

আমি শুনতে পারবো না।"[২৩] পিতা কীর্তিরাম বিধবা কন্যার গর্ভধারণের কথা শোনামাত্র তাঁর বিধবা কন্যার মৃত্যু চেয়েছেন। কীর্ত্তিমান আক্ষেপে জানিয়েছেন,—"*বিধবা কন্যা গর্ভবতী! এ লজ্জায় আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করতেছে।*"[২৪]

সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে গর্ভবতী সুলোচনা বিষপানে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। সুলোচনা তাঁর বিচার বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করেছে, উনিশ শতকীয় সমাজ ব্যবস্থায় পদস্খলিত নারীদের গৃহে কোন জায়গা নেই। একে বিধবা তাতে আবার, কলঙ্কিত নারী, যার দাম সমাজের ভোগ্যপণ্যের মত। ফলে সুলোচনা মৃত্যুকেই সুখকর বলে মনে করে। সুলোচনার বিষপান করার সংবাদ সুখময়ী মারফৎ পদ্মাবতী, কীর্ত্তিমান এবং পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়ের কর্ণগোচর হয়। তারা একে একে সুলোচনার কাছে এসে দাঁড়ায়। পদ্মাবতী কন্যার মৃত্যুর আসন্ন সংবাদে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন। পদ্মাবতী তাঁর কন্যাকে বাঁচাতে নানারকম চেষ্টায় উদ্যোগী হন। নাপেতানী রসবতীও সুলোচনার কাছে এসে নিজ কর্মের জন্য কাতর হয়ে পড়ে। সুলোচনাকে বাঁচাতে সে মরিয়া হয়। সুলোচনার প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ায় তার পিপাসা বাড়ে। সে জল খেতে চায়। পদ্মাবতী নিজ কন্যার প্রাণ রক্ষা করতে চিকিৎসার প্রয়োজন অনুভব করেন। কিন্তু সুলোচনা শুধুমাত্র জলের জন্য কাতর হয়ে পড়ে। সুলোচনার জন্য জল আনা হলে সুলোচনা জলের দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু সুলোচনার বৌদি বিধবা সুখময়ী তাকে জল খেতে দেয় না। কারণ একাদশীর দিন বিধবা মহিলাদের নির্জলা উপোস চলে। মুখে যদি জল দেওয়া হয়, তবে ইহকালের সঙ্গে পরকালটাও লোপ পাবে। পাপের ভাগী হবে সুলোচনা। সুলোচনার কুকর্মে ইহকাল নষ্ট হয়েছে, শেষে একাদশীর নিয়ম ভাঙলে পরকালটাও খোয়াবে সে। তাই তার মুখে নয়, চোখে কানে জল দেওয়া হয়। সুখময়ীর কথায়, তৎকালীন সমাজের রক্তচক্ষু কতটা কষ্টদায়ক তা প্রকাশিত। সুখময়ী তার শাশুড়ী পদ্মাবতীকে কানে কানে বলে,—"*ওমা, আজ যে একাদশী, ওকে কেমন করে জল দেবে। অভাগিনীর ইহকালটা গেছে আবার পরকালটাও যাবে। ওতো মরবেই, আর ওকে জল দিলে কি হবে।*"[২৫]

সুখময়ীও বিধবা কিন্তু সে কোনো কুপ্রবৃত্তির শিকার নয়। ধর্মে কর্মে মন তার অবিচল। তাই একাদশীর ব্রত তার কাছে নিষ্ঠার স্বরূপ, ইহকালের পুণ্যপথ। সে সুলোচনাকে পরলোকের ধর্ম বিনষ্ট করতে দিতে পারে না। মর্মান্তিক সামাজিক নিয়মে সুলোচনার মৃত্যুও স্বাভাবিক ভাবে হতে পারে না। সুলোচনার মৃত্যু হবে জেনেও হিন্দু আচার মেনে তাকে জল দেওয়া যাবে না। জীবনের চেয়েও নিয়মের গণ্ডীতে প্রত্যেক বিধবা রমণীরা মৃত্যুসম যন্ত্রণা ভোগ করেছেন।

পাপ, পুণ্য জীবনের চেয়ে বেশী দামী হয়ে উঠেছে। তাই সুলোচনার মৃত্যু মুহূর্তে আক্ষেপ করে জানিয়েছে—"*হা বিধাতা! অভাগিনীর মরণটাও একাদশীর দিনে হলো! মরণকালে একটু জল খেতেও পেলাম না! জল জল করে প্রাণ বেরুলো!*"[২৬] মৃত্যু অবধারিত জেনেও সুলোচনার শেষ ইচ্ছাটা পূর্ণ করা যাবে না শুধুমাত্র একাদশীর জন্য। সুখময়ী প্রকাশ ভঙ্গীতে সামাজিক বিধিনিষেধ দারুণভাবে প্রকাশিত,—"*মা, তুমি কি পাগল হয়েছ? একাদশীর দিনে রাঁড় মানুষের মুখে জল দেবে? ও পিপাসা আর একটু গৌণে ভাল হবে। বরং চোকে কানে একটু জল দেই।*"[২৭] মৃত্যুপথযাত্রী সুলোচনার জন্য ব্যাকুল মাতা স্বামীকে বিধবা বিবাহের কারণে ভর্ৎসনা করলে কীর্ত্তিরাম বলেন,—অধর্মে পতিতা কন্যার প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি কীর্ত্তিরামের ধর্মবহির্ভূত। বিধবা কন্যা ব্যভিচারিণী হয়ে অপরাধ করেছে কিন্তু কীর্ত্তিরাম বিধবা বিবাহের অসম্মতি করে কোনো অপরাধ করেননি। কন্যার মৃত্যুতেও পিতার নিজ কৃতকর্মের জন্য কোনপ্রকার আক্ষেপ নেই। উপর্যুপরি পিতা কীর্ত্তিরামের বক্তব্য,—"*পাপীয়সী! এদেশে কি আর বিধবা নাই, তুমিই যাবজ্জীবন ক্লেশ পেয়েছ, আর কি কেহ ক্লেশ পায় নাই? সকলেই কি তোমার মত পাপপঙ্কে নিমগ্না হয়েছে?*"[২৮]

বস্তুত সুলোচনার এই প্রশ্ন ও আক্ষেপ, সমগ্র বিধবা নারীদের অন্তর বিদীর্ণ করা আক্ষেপ। সামাজিক নিয়মের জালে প্রত্যেক বিধবা নারীদের জীবন কষ্টময়। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নির্বিকার। সুলোচনা তার মৃত্যুকালীন সময়ে পিতার সামনে পিতার প্রশ্নে উত্তর দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। সে তার পিতাকে নারীদের সহ্য ক্ষমতার ভিন্নতা সম্পর্কে জানায়। যে নারীর ধর্মে মতি হয় না, তাদের সহ্য ক্ষমতা থাকে না। স্বাভাবিক সুপ্রবৃত্তি যাদের থাকে তারা কখনই দুরাচারী হয়ে না। কিন্তু যাদের নেই তারা স্বাভাবিক নিয়মেই কুপ্রবৃত্তির আশ্রয় নেয়। সুলোচনাও কুপ্রবৃত্তির শিকার। তাই তার পক্ষে কলঙ্কভার এসে পড়েছে। কীর্ত্তিরাম কন্যার যন্ত্রণা বুঝতে পেরেছে শেষপর্যন্ত । 'বিধবা বিবাহ' নাটকে দুটি বিধবা নারীর সমান্তরাল কাহিনী রয়েছে -একটি সুলোচনার কাহিনী অপরটি প্রসন্নের কাহিনী। প্রসন্ন কায়স্থ সম্প্রদায়ের বাল বিধবা। বিধবা বিবাহের আইনগত সমর্থন নিয়ে তাঁর পিতা পুনর্বিবাহের উদ্যোগ নিয়েছে। তাঁর বিয়েকে কেন্দ্র করে সমাজে নিন্দা ও কানাকানি চলেছে নারী মহলে। এক কুলীন নারী সত্যভামা বিধবা প্রসন্নের পুনর্বিবাহের খবরে হতবাক হয়ে বলেছে,—"*ওমা সে কি গো! কোথা যাব মা। রাঁড়ের বে'র ব্যবস্থা বেরয়েছে বলে কি সত্যি সত্যি বে কত্তে হয়?*"[২৯] যদিও এই ঘটনা নাটকের কাহিনীতে সরাসরি আসেনি। কিন্তু নাট্যকার পরস্পর বৈপরীত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সমাজের দুটি ছবি তুলে ধরেছেন। প্রগতিশীল

বনাম রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্বকে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে যে ঝড় উঠেছিল, তারই প্রামাণ্য দলিল উমেশচন্দ্র মিত্রের '*বিধবা বিবাহ নাটক*'। বিধবা রমণীর মানসিক যন্ত্রণা, বৈধব্য জীবনের অপরিসীম আক্ষেপ, সামাজিক বিধিনিষেধ, বিধবা রমণীর জীবনে প্রেমের সঞ্চার, ফল স্বরূপ গর্ভবতী হওয়া ও শেষে আত্মহননের পথ বেছে নেওয়া—এসবই তৎকালীন সমাজজীবনে ঘটে যাওয়া এক অকৃত্রিম সত্য, যা এ নাটকে ফুটে উঠেছে। বস্তুত বিধবা নারী সুলোচনার বৈধব্য যন্ত্রণা, মানসিক অস্থিরতা, প্রেম ও পদস্খলনের কথা এ নাটকে উঠে এসেছে। বিধবার পুনর্বিবাহকে সমর্থন করা হয়েছে এ নাটকে।

সুলোচনা চরিত্রটির বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। সেকালে অনেক বিধবা রমণী সুলোচনার মত বিধবা বিবাহের স্বপ্ন দেখেছিল। *'সম্বাদ ভাস্কর'* পত্রিকায় শ্রীবিদ্যা নামক জনৈক মহিলার একটি পত্র সূত্রে জানা যায় অল্প বয়সী বিধবার করুণ আর্ত কণ্ঠস্বর। জনৈক মহিলা লিখেছেন, —''*আপনাদিগের উদ্যোগে এ দেশের দারুণ কুসংস্কার পরাভূত হইয়া বিধবা বিবাহ চালিত হইবেক বটে, কিন্তু এক্ষণে তাহার অনেক বিলম্ব দেখা যাইতেছে। আমার শরীরে স্বামী সুখের সম্ভাবনা নাই, তথাপি এই সুখ হইল যে মরিবার সময় পরমানন্দে প্রাণত্যাগ করিব। কারণ যদি আমি ঐ সুখ হইতে বঞ্চিত হইলাম তথাপি আমার ন্যায় শতশত স্বামীহীনা কামিনীর যে সুখ হইবে ইহাই স্মরণ করিয়া মরিব।*''[৩০] গর্ভবতী সুলোচনা সমাজ কলঙ্কের ভয়ে আত্মহত্যা করেছে। সমাজ ভয় তাকে বাধ্য করেছে আত্মহননের পথ বেছে নিতে। মৃত্যুকালে একফোঁটা জলও মুখে নিতে পারেনি। সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে হিন্দুর বৈধব্য আচার। 'একঘরে' হবার ভয়ে এক গভীর সামাজিক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে অভিভাবকেরাও অসহায় ভাবে নিজ কন্যার সংকট পরিস্থিতিকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন এবং বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গটি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন।

১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয় রাধামাধব মিত্রের *'বিধবা মনোরঞ্জন'* নাটক। *'বিধবা মনোরঞ্জন'* নাটকে দেখা যায়,বিধবা কুমুদিনী ঘোষেদের বাড়ী বেড়াতে যেতে চায়। সেকারণে সে মায়ের কাছ থেকে তিরস্কৃত হয়। সমাজনিন্দার কথা স্মরণ করে কুমুদিনীর মা জানিয়েছে, —''*একে রাঁড়, তায় সমত্তো বয়েস্ (গালে হাত দিয়া) ছি! ছি! ব্যাড়াতে যেতে লজ্জা করে না, লোকে দেখলে বলবে কি?*''[৩১] কুমুদিনীর মা আরো জানিয়েছে,—''*কি ভাবে ব্যাড়াতে চাস্, কি ভেবে বাহিরে যাস, বুঝিতে না পারি কিছু, বুঝি শেষে ঢলাবি।*''[৩২] বোঝা যায় উনিশ শতকের

যুগ পরিবেশে বিধবা যৌবনবতী মেয়ে সম্পর্কে অন্তঃপুরে মায়েদের চিন্তার শেষ নেই। মেয়ে যদি বিপথে চলে যায়—এই আশঙ্কা প্রকাশিত হয়েছে কুমুদিনীর মায়ের সংলাপে। বিরুদ্ধবাদীরা বিধবার পুনর্বিবাহকে কলিকালের লক্ষণ বলে বিরোধিতা করেছেন এবং আক্ষেপ করে বলেছেন,

— *'' পাপেতে মজিল ধরা, জীবন না যায় ধরা*

মরিলেই বাঁচি মানে মানে।''[৩৩]

সেকালে বিধবার পুনর্বিবাহকে অনেক বিধবা নারী মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। সেকারণে তাঁরা মনে করেছেন, বৈধব্য জীবন নিয়ে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা সত্ত্বর মরণই শ্রেয়।

'বিধবা মনোরঞ্জন' নাটকে বিলাসিনী ঘটকী রামনিধি ন্যায়রত্নের স্ত্রীর কাছে সমাজের কদাচার ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার রূঢ় মানসিকতাকে প্রকাশ করেছেন,—'' *মেয়ে সস্তা হোয়েছে, বর মাগ্যি, যার মেয়ে আছে তার সর্ব্বনাশ, আর যার বেটা আচে তার পৌষ মাস্। এখন তো অর কুলীন মৌলিকের বিবেচনা নেই, যার টাকা আচে সেই কুলীন, যার টাকা নেই মা সেই মৌলিক। বেটার বে দিলে জিনিষ পত্রে ঘরকন্না পূরে যায়, আর মেয়ের বে দিতে গেলে ফকীর হোতে হয়।''*[৩৪] সমাজে নারী পুরুষের ভেদাভেদকে নাট্যকার অসামান্য ভাবে ঘটকীর সংলাপে প্রকাশ করেছেন। বিধবা বিবাহের পাশাপাশি নাট্যকার পণপ্রথার নিষ্ঠুরতাকেও তুলে ধরেছেন। ঘটকী আরো জানিয়েছে বিদ্বান না হলে কেউ বিধবা বিবাহ করতে চায় না। উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর বিবাহে উভয়পক্ষ হতে উপঢৌকন পাওয়া উচিত। কিন্তু সমাজে অসাম্য চালু রয়েছে। তাই বিবাহ হতে বিবাহ সম্পর্ক বন্ধন সর্বত্রই অসাম্য বিরাজমান।

এ প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণে আসে সমকালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' প্রবন্ধের কথা। 'সাম্য' (১৮৭৯) প্রবন্ধ গ্রন্থে স্ত্রী ও পুরুষের অধিকার প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্র খুব জোরের সঙ্গেই বিধবা-বিবাহকে সমর্থন করেছেন। *'সাম্য'* প্রবন্ধেরপঞ্চম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,—'' *মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট—ইহাই সাম্যনীতি। ...যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণের সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। ...অস্মদ্দেশে স্ত্রী পুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য, তাহা এক্ষণে আমাদিগের দেশীয়গণের কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে... অনেকে মনে করেন যে, চিরবৈধব্য বন্ধনে, হিন্দু মহিলাদিগের পাতিব্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে।...কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যদি তাই হয়, তবে নিয়মটি একতরফা রাখ কেন? বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্য্য পুরুষের চিরপত্নীহীনতা*

বিধান কর না কেন? তুমি মরিলে, তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে, তোমারও আর গতি হইবে না, যদি এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হইবে। এবং দাম্পত্য সুখ, গার্হস্থ্য সুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সে নিয়ম কেন?"[৩৫] বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র সমাজনিয়ন্ত্রক পুরুষশক্তিকে বিদ্রুপ করেছেন। *'বিধবা মনোরঞ্জন'* নাটকে ঘটকী নাপেতানীর বক্তব্যে,— অনুরূপ সমাজ অসাম্যের কথা উঠে এসেছে।

অজ্ঞাতনামা রচিত *'বিধবা বিষম বিপদ'* (১৮৫৬) নাটকে নাট্যকার বাঙালি গৃহস্থ পরিবারে বিধবা রমণী থাকার সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। কুলীন মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা যৌবন-জ্বালায় অস্থির হয়ে, পাড়ার নিম্ন জাতির চৌকিদারের সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হয় এবং গর্ভবতী হয়। অবশেষে কন্যার গর্ভপাত ঘটাতে বাধ্য হন মুখোপাধ্যায়। একথা লোক জানাজানি হলে, সমাজের মুখ বন্ধ করতে মুখোপাধ্যায়কে মহাভোজের আয়োজন করতে হয়; ঘুষ প্রদানের ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করতে হয়। আর এসবের জন্য নিজ বসত বাটী বন্ধক দিয়ে অর্থের সংস্থান করতে হয়। মুখোপাধ্যায় বিধবা বিবাহের সমর্থন করে নাটকের অন্তিমে জানিয়েছে,—"*চাড়ুয্যে বিধবা মেয়ের বিয়ে দেবে বল্লে। এ অপেক্ষা সে সৎকর্ম, তার আর সন্দেহ নাই। বামন পণ্ডিত বেটারা যে মরতেছে। বেটারা কি টের পায় না, আপনাদের ঘরেই দেখতে পায় না, বিধবা কন্যার জন্যে যবনান্ত পর্যন্ত হতে হচ্ছে। এর চেয়ে কি বিয়ে দেওয়া ভাল নয়।*"[৩৬] অর্থাৎ নাট্যকার সমাজ সংকট হিসাবে উচ্চবর্ণের হিন্দুর জাত খোয়ানোর প্রসঙ্গকে বড় করে দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে ভ্রূণ হত্যার সংকটকে উপস্থাপিত করেছেন। বিধবা কন্যার গর্ভপাত ঘটানোর পর মুখোপাধ্যায় গৃহিণী জানিয়েছেন,—"*পোড়ালোকের ভয়ে জাতির ভয়ে কি দুষ্কর্মই না করতে হলো। হায় হায়! শুনেছি শাস্ত্রে বলে বিধবা মেয়ের আবার বিয়ে হতে পারে, পোড়াদেশের লোকে যদি শাস্ত্রের মতে চলে, তা হলে আর এ নিষ্ঠুর কর্ম, এ পাপ কর্ম করতে হয় না। কি করবো, লোক লজ্জায়, জেতের ভয়ে, এমন কর্মও করতে হলো।*"[৩৭] বস্তুত ঘরে বিধবা কন্যা থাকা মানে, সামাজিক কলঙ্কের আশঙ্কা অমূলক নয়। বিধবার প্রণয়, বিধবা গর্ভ সঞ্চার, ভ্রূণ হত্যা সেকালে ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। একারণেই নাট্যকারেরা বিধবার পুনর্বিবাহের পক্ষে সওয়াল করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের *'চপলাচিত্তচাপল্য'* (১৮৫৭) নাটকে বৈধব্য জীবনের দুঃখ অপেক্ষা, বিধবা চপলার অনুরাগ বর্ণিত হয়েছে কাব্যিক ভঙ্গিমায়। এ নাটকে উঠে এসেছে

বৈধব্যের সংকট চিত্র। বাল বিধবা চপলা যেভাবে বৈধব্য আচার পালন করেছে তাতে পাড়ার বিধবারা সমালোচনা করেছে। একাদশীর দিনকে তারা বিবাহের দিন বলে ঠাট্টা করেছে। এই অংশে ধরা পড়েছে, অন্তঃপুরে ধনী গৃহের বিধবা ও দরিদ্র ঘরের বিধবার আচার পালনের তারতম্য। মোক্ষদাকে বিনোদা জানিয়েছে,—''*...তা ওমা সে পোনের বছরের মেয়ে, সে দুদ্‌গঙ্গাজল খেয়ে একাদশী করেচে। ... কেন বোন্‌, সে বড়মানসের মেয়ে, সে সব কত্তে পারে, তাতে আর পাপ নেই। বোন্‌ সাধে বামন পন্ডিতের প্রতি অশ্রদ্ধা হয়।*''[৩৮] বিনোদা তার স্মৃতিকাতরতায় জানায়, সে ন'বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল। প্রথমবার একাদশীর দিন ভুল করে সে ভাত খেয়ে ফেলেছিল বলে সবাই তার বাবাকে 'একঘরে' করতে চেয়েছিল। পরের একদশীতে কেউ তাকে কিছু খেতে দেয়নি—'নিরম্বু উপবাস'। মোক্ষদা জানিয়েছে,—''*আষাঢ়ান্ত বেলা, তাতে ন বছর বয়েস তেষ্টায় ছাতি ফেটে যেতে লাগলো, শেষে বেলান্তে কেমন হয়ে একেবারে ঘুরে পড়লেম। তখন মা করেন কি, গঙ্গাজল মুখে এনে দেন তবে রক্ষা পাই।*''[৩৯]

নাট্যকার যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় দুই শ্রেণীর বিধবাকে তাঁর নাটকে উপস্থাপিত করেছেন। অপেক্ষাকৃত ধনী ও শিক্ষিত পরিবারের বালবিধবারা বিধবা বিবাহে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং দরিদ্র পরিবারের বিধবারা আচারের যূপকাষ্ঠে বলি হতে বাধ্য হয়েছিল। দরিদ্র পরিবারের বিধবা বিনোদা ভবিষ্যবাণী করে জানিয়েছে,—''*এই বিধবার বে চলিত হলে, চপলারই কোন্‌দিন বে হয় দেখ। পরে আর যার হোক্‌।*''[৪০] বিনোদা ও মোক্ষদা নিজেদের বৈধব্য সংস্কার ও বৈধব্য আচার পালনের মহিমা জাহির করলেও মনের গোপন সত্যিকথাটা প্রকাশ করে ফেলেছে নিজেদের অজান্তে। বিনোদা জানিয়েছে,—''*আমি ভাই পূজো করি বটে, কিন্তু মন্তর-টন্তর সকল সময় মনে থাকে না। ফুলচন্ননই জলে ভাসাই।*''[৪১] মোক্ষদা, বিনোদার কথার জবাবে জানিয়েছে, —''*তুমি ভাই মনের কথা বল্লে, ভাই আমিও বলি, আমিওত, একদিন সব মন্তর পড়ি না, হোলো ধ্যান কল্লেম তো জপ সমাপন কল্লেম না, এমনি তো প্রায়ই হয়।*''[৪২]

বিধবার বৈধব্য আচার ও ব্রহ্মচর্য পালনের যে শাস্ত্রীয় নির্দেশ তা ভিত্তিহীন। এই শাস্ত্রীয় নির্দেশ পালনে অল্পবয়সী বিধবার কোনো আন্তরিক প্রেরণা থাকে না। বিধবা বিনোদার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে অশ্রদ্ধার কথা,—''*সত্তি বল্‌তে কি, এখন আমাদের পূজো করবার বয়েস হয় নি, মনই স্থির থাকে না, কতদিকে যায়। তবে না কল্লে লোকে নিন্দে কর্ব্বে, আর গুরুপুরুত দেখা হলেই, আশীর্ব্বাদ করেন। "ধর্ম্মে মতি হোক" তাই বোন্‌ ধর্ম্ম করি।*''[৪৩] বোঝা যায় অকাল বৈধব্য ও তার ধর্ম্মাচরণ কি প্রকার অন্তঃসারশূন্য। সমকালে বিধবা বিবাহকে অনেকেই সুনজরে

দেখেননি। মালিনী গর্ভপাত করানোর ঔষধ বিক্রি করে দুপয়সা কামায়। মালিনী ভেবেছে বিধবা বিবাহ চালু হলে তার ব্যবসা মার খাবে। গভীর আশঙ্কায় সে জানিয়েছে,—'' *ভাই এখন যাহোক অপ্‌পবইসি বিধবা ছুঁড়িগুলোর মন যুগিয়ে চল্‌তে পাল্লে যখন যা ধরি, তা তারা দেয় থোয়, আর বেঁধে গেলে কেউ পাঁচসিকে ছাড়ায় না, ত এমন ত মাসের মধ্যে হচ্চেই। তা যদি বিধবার বে চলিত হয়, তবে লুকিয়ে আর একর্ম্ম কর্ব্বে কেন, পেট বাঁধলে ওষুধ খাবেই বা কেন। তা যদ্দিন না হয় আমার পক্ষেই ভাল।*''[৪৪]

বালবিধবা চপলাকে পিতা বাসব নিয়ম নিষ্ঠায় বৈধব্য আচার পালন করিয়ে এসেছে। চপলা চপলমতি, অস্থির বালিকা। কৃষ্ণকথা পাঠে তার মন বসে না। সখী কামিনীর কাছে চপলা জানিয়েছে,—'' *আমার ত কথা শুনতে গেলে কান্না পায়। কেষ্ট গোপিণীগণের বস্ত্রহরণ কোরে, কদমগাছে উঠলেন, রাধিকার মানভঞ্জন কল্লেন, নিকুঞ্জে বেহারে গেলেন, এসব রসের কথা কি আর ভাল লাগে? বিকেলবেলা কথা শুনে সমস্ত রাত অসুখে যায়।*''[৪৫] অত্যন্ত মনস্তাত্ত্বিক ভাবে নাট্যকার নারী মনের যৌবন অন্তর্দাহকে প্রস্ফুটিত করেছেন চপলার এই উক্তির মধ্য দিয়ে। নাট্যকার যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, এ নাটকে বর্ণকৌলিন্য ও অর্থকৌলিন্যের সমান্তরাল ছবি নির্মাণ করেছেন। অর্থকৌলিন্যে গরীয়ান ঘরের বিধবার জন্য একাদশীর উপবাস অনেক শিথিল। অন্যদিকে দরিদ্র ঘরের বিধবার বৈধব্য আচার কঠোর ও হৃদয়হীন। এ নাটকে দেখা যায়, জমিদার কন্যা চপলা বিধবা হয়েও রাঙাপাড় শাড়ী পরেছে, গয়না পরেছে অর্থকৌলিন্যের গরবে গরবিনী হয়ে। অন্যদিকে চপলার সমবয়সী অন্য ঘরের বিধবারা সাধারণ বৈধব্য সংস্কারের ব্রত যন্ত্রে ও আচার সর্বস্বতায় দগ্ধে মরেছে।

উমেশচন্দ্র মিত্রের '*বিধবা বিবাহ নাটক*'-এ ঘোষ ও দত্ত পরিবারের বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। অজ্ঞাতনামা রচিত '*বিধবা বিষম বিপদ*' নাটকে—মুখোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বিধবা বিবাহ সংঘটিত হয়েছে। আর, '*বিধবা মনোরঞ্জন*' নাটকে, একই সঙ্গে ন্যায়রত্ন, ঘোষ ও দত্ত পরিবারের 'বিধবা বিবাহ' প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। এদিক থেকে বলা যায় নাট্যকারেরা বিধবা বিবাহের পাশাপাশি অসবর্ণ বিবাহের মত নতুন চেতনার বিষয়কে উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল মনের পরিচয় দিয়েছেন। সমালোচক প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, নাট্যকার বিহারীলাল নন্দী '*বিধবা পরিণয়োৎসব*'[৪৬] নামে একটি নাটক রচনা করেন। নাটকের নাম শুনে বোঝা যায়, বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ পরবর্তীকালীন উৎসবমুখর সুখচ্ছবির ইঙ্গিত আছে । অনেক অনুসন্ধান করেও এ নাটকটি আমাদের হাতে আসেনি।

অসমীয়া নাট্যকার গুণাভিরাম শর্ম্মা ১৮৫৭ সালে লেখেন *'রামনবমী'* নাটক। নাটকটি সমকালে বাংলা ভাষায় 'অরুণোদয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ নাটকে নাট্যকার 'নবমী' নামক এক বাল বিধবার সংকট চিত্রকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে নবমী গর্ভবতী হয়েছে এবং গর্ভস্থ সন্তানের কথা ভেবে, নিজ পাপ কর্মের কথা ভেবে বিচলিত হয়েছে, আশঙ্কিত হয়েছে। বার বার নবমী আক্ষেপ করে করে জানিয়েছে, বিধবা হলেই নারীর কাম রিপু বিলীন হয়ে যায় না। কামভাব বিধবা নারীকে বিপথে চালিত করে। নাট্যকার নবমীর মনের চিত্তসংকটকে রূপ দিয়েছেন এভাবে,—

''বিধবা নারীর পতি সঙ্গ, ঈশ্বরর ইচ্ছা মোহে যদি
কামভাব তার নাথাকিত অঙ্গ ভরি।।''[৪৭]

নাট্যকার তারকনাথ চূড়ামণি *'সপত্নী নাটক'* (১৮৫৮)-এ দেখিয়েছেন, ভূধর-সৌদামিনী ও ব্রজবিলাস-মোহিনীর নিতান্ত বাল্য বয়সে বিবাহ হয়। বাল্যবিবাহের কারণেই তারা অসুখী। স্বামী বিরহিণী তিন যুবতী বোন কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলা জৈবিক তাড়নায় আত্মসংযমে অক্ষম হয়ে তাদের বাড়িতে আশ্রিত কামদেব নামক এক যুবকের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এই তিন কন্যার মা হরমোহিনী এবং পিতা রমাকান্ত এই ব্যভিচার সম্পর্কে সব জেনেও বাধা দিতে পারেনি। এসব কুলীন ব্যভিচারিণী স্ত্রীর কোন সন্তান নেই। বোঝা যায়, ভ্রূণহত্যাই ছিল তাদের পথ।

বহুবিবাহের কুফল নিয়ে নাটক রচনা করতে গিয়ে নাট্যকার প্রসঙ্গক্রমে সমকালীন সমাজ আন্দোলন 'বিধবার পুনর্বিবাহ' প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। কৌলিন্য প্রথা ও বহুবিবাহের ফলেই সমাজে দেখা দিয়েছিল বিধবার সংকট ও সমস্যা। আর সেকারণেই নাট্যকার বহুবিবাহের কুফল নিয়ে বলতে গিয়ে বিধবা সংকট ও বিদ্যাসাগরের সমাজ আন্দোলনকে নাট্যদৃশ্যে তুলে ধরেছেন। *'সপত্নী নাটকে'* (১৮৫৮) এর দ্বিতীয় অঙ্কে সূর্য্যকান্ত ও রামগতির তর্কাতর্কি সংলাপে উঠে এসেছে ১৮৫৬ পরবর্তীকালীন সময়ের বিধবা বিবাহ আইন পাস হওয়ার প্রসঙ্গ ও বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের বিষয়। সমকালীন সমাজ ইতিহাসের ছবিও তুলে ধরেছেন নাট্যকার,—*''সূর্য্যকান্ত (সদম্ভে)।। আবার জিজ্ঞেস করিতেছ হে? রাঁড়ের বিবাহ হইতে চলিল? যাহা কর্ণেও শুনি নাই। বেদে নেই; পুরাণে নেই; কোরাণেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না? আরও কি দেশে মানুষ আছে বল?*

রামগতি।। কেন মহাশয়! এই যে বিদ্যাসাগর মহা--।

সূর্য্যকান্ত। *(রামগতির কথা শেষ না হইতে হইতেই সক্রোধে) আঃ যাও যাও! ওটার আর নাম করিও না। শুনিলে রাগ জন্মে।*

রামগতি।। *সে কি মহাশয়। এ কি বলেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাতঃস্মরণীয় লোক, তাঁহার নাম শুনিলে আবার আপনকার রাগ হয়? সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হয় না? আর দেশে লোক নাই বলেন কি? তিনি যখন বিধবা বিবাহ বিষয়ে প্রথম ব্যবস্থা বাহির করেন, তখন নবদ্বীপ প্রভৃতি যাবতীয় সমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা তাঁহার বিপক্ষ হইয়া ছিলেন এবং কত শত আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন একথা সত্য কি না?'*[৪৮]

বস্তুত নাট্যকার সমকালীন সমাজ মানসিকতায় বিধবার সংকট চিত্রকে এ নাটকে তুলে ধরেছেন। এছাড়া নাট্যকার আরো দেখিয়েছেন, বহুবিবাহ হোক আর বিধবা বিবাহ হোক—পুনর্বিবাহের অনুষ্ঠানে থাকতো কামিনী বিলাস ও অশ্লীলতার ছড়াছড়ি। বিবাহ অনুষ্ঠানে কুল কামিনীদিগের মনের অবস্থা বর্ণনা করে নাট্যকার পদ্য সংলাপে লিখেছেন,—

''কি আনন্দ নিশিযোগে সুযোগ সময়।
সয়িতে যাইব জল কোলাহলময়।।
কে কার লইবে তত্ত্ব কোথা রবে কেবা।
আনন্দে করিব আজি বাসনার সেবা।।
পিঞ্জরে থাকিয়া বদ্ধ যত কষ্ট পাই।
যোগে যাগে ঘুরে যাবে সে সব বালাই।।
সাজিব সুসাজে আজি যাব বেশ্যা বেশে।
বলাবলী গলাগলী ঢলাঢলী শেষে।।
বাসর আসরে বটে মজা আছে কিছু।
.....
ভাগ্যবলে আলো যদি নেবে একবার।
ভাগাড়ের মধ্যে শত শকনী সঞ্চার।।
এ নয় সেরূপ শুধু রমণী বাজার।
পুরুষ পরেশ আছে হাজার হাজার।।
বিশেষ যাহার সঙ্গে আছে যার মন।

সে কি কভু ছেড়্যেদেয় সুযোগ এমন?

.....

এ বাড়ী ওবাড়ী যাব পরিয়া ঢাকাই।

ঢাকাই কেবল মাত্র কিছু না ঢাকাই।।

মাঝে মাঝে রং মশাল জ্বলিবে যখন।

দেখিব দেখাব রং রসাল তখন।।

.....

ধন্য রে হিন্দুর ধর্ম্ম ধন্য আচরণ।

নাহি হেরি কোন দেশে আনন্দ এমন।।

বলিহারি দণ্ডবত্ বাঙ্গালির দেশে।।"[৪৯]

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠানের সামাজিক কদাচারকে এভাবেই নাট্যকার তুলে ধরেছেন তাঁর *'সপত্নী'* নাটকে।

দীনবন্ধু মিত্রের *'নীলদর্পণ'* (১৮৬০) নাটকে বিধবা চরিত্র হিসাবে আদুরী চিত্রিত হয়েছে। আদুরী বিধবা হয়েও বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেছে। আদুরী প্রগলভা—সংস্কারবদ্ধ মন নিয়ে বিধবা বিবাহকে সে সমর্থন করতে পারেনি। কিন্তু তাঁর স্বামী হারানোর যন্ত্রণা ও স্বামীর সুখস্মৃতি তাকে স্মৃতিকাতর করে তুলেছে। সেই অনুসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে তার অতৃপ্ত যৌবন বাসনা। বৈধব্য সংস্কার ও ভোগবাসনার স্মৃতিকাতরতায় সে বিচলিত হয়েছে এবং অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছে বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা।

শ্রীশিমূয়েল পিরবক্স রচিত *'বিধবাবিরহ নাটক'* স্ত্রী চরিত্র নির্ভর নাটক। এ নাটকে মনোমোহিনী, তাঁর মাতা, চাঁপা দাসী, পদি, মনোমোহিনীর দাসী, সুখদা, মনোহারী, বামা, নঙ্গরা প্রভৃতি চরিত্র বিন্যাসের মধ্য দিয়ে নাট্যকার কাহিনী নির্মাণ করেছেন। শিমূয়েল পিরবক্স রচিত *'বিধবা বিরহ নাটক'* (১৮৬০)-এ দেখানো হয়েছে,—ভদ্র ঘরের বিধবা কন্যা, পিতার ব্যভিচারে ক্ষুব্ধ হয়ে, পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করেছে। নঙ্গরা নামক এক নীচ দুশ্চরিত্র যুবকের প্রলোভনে ভুলে গহনাপত্র চুরি করে ঘর ছেড়েছে।

মনোমোহিনী ও মনোহরী দুজনেই বিধবা। মনোহরী বৈধব্য জীবনকেই সে ভবিতব্য হিসাবে মেনে নিয়েছে। অন্যদিকে, মনোমোহিনী বৈধব্য জীবনকে ভোগের দৃষ্টিতে দেখেছে। বৈধব্য জীবনের মানসিক কষ্ট প্রকাশ করে মনোমোহিনী জানিয়েছে,—

‘‘ কামে কম্পান্বিত দেহ করি হায় হায়।
পতির বিচ্ছেদে বুঝি মম প্রাণ যায়।।
বিরহ অনল মম সদা জ্বলে মনে।
বিধবা হইয়া আর বাঁচিবে কেমনে।।’’[৫০]

যৌবনকালে উপনীত মনোমোহিনীর দেহ কামে জর্জরিত হয়েছে। বিধবা মনোমোহিনী তনুমন শান্ত করার উপায় খুঁজে পায়নি,—

‘‘ তনু মম জীর্ণ হল মদনের বাণে।
নাগর বিহনে ঘরে থাকিব কেমনে।।’’[৫১]

মনোমোহিনী দীর্ঘ বারো-চোদ্দ বছর যাবৎ বিধবা। শৈশব কালে পতির বিহনে বুঝতেই পারেনি— পতিসঙ্গ সুখ কি জিনিস। শুধুমাত্র উপবাস, ব্রতপালন, আতপচাল খেয়ে দিন কাটিয়েছে। বিধবা হওয়া অবধি কোনো পুরুষ মানুষের মুখও দেখেনি সে। মনোমোহিনীর পিতা সম্পদশালী। ভালো খাওয়া, পরায় মনোমোহিনী কোনদিনও অভাববোধ করেনি। কিন্তু সে ভালো নেই। মনোমোহিনী কামপীড়ায় দগ্ধ হয়ে কুপথে পা বাড়িয়েছে। মনোমোহিনী বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে। কারণ বিধবাদের বিবাহ না হবার কারণে সমাজে বহু কুৎসা ছড়িয়ে পড়ে।

মনোমোহিনীর পিতা বিধবা বিবাহের সপক্ষে। মনোমোহিনী পিতার গুণপনা সম্পর্কে মনোহরীকে জানিয়েছে,—*‘‘ বাবার গুণের কথা আর বলে ফুরাইতে পারিনে-বাবার বাহাত্তর বছরের উপর বয়েস হয়েচে বাবার আগেকার স্ত্রীর যে চারিটি ছেলে আছে তারাও প্রায় বুড়ো হলো এসে-মার মুখে শুনেছি বাবার আগেকার স্ত্রীর মরণের পরে ছয়মাস হয় নাই বাবা আবার আমার মাকে বিবাহ কল্লেন, তা কেবল নয় আমাদের চাঁপা দাসীরও পেট করে ফেল্লেন, আর তাতেই যে ক্ষান্ত আছেন তা নয়, মা আর চাঁপা ছাড়া বাবার আর দুটী আছে, মড়ল পুকুরের ধারে যার বাড়ি তার নাম সুন্দরী সে একজন আর ভোজা নাপ্তের মেয়ে তারা একজন এই দুজনকে বাবা এখন রেখেছেন।’’*[৫২]

নাট্যকার বিদ্যাসাগরের সমকালীন এমন এক শ্রেণীর মানুষদের কথা তুলে ধরেছেন, যাঁরা জীবনকে উপভোগের উদ্দেশ্যে বিধবা বিবাহে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু নিজগৃহে বালবিধবার পুনর্বিবাহ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। মনোমোহিনীর পিতা উনিশ শতকের সেই প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র যাঁরা বিধবার পুনর্বিবাহ আন্দোলনকে কুপথে চালিত করেছিল। মনোমোহিনী জানিয়েছে,—*‘‘ সে যা হোক দুঃখের বিষয় এই যে বাবা এত বুড় হলেও এতটা কচ্ছেন তবে*

আমি যে তাঁর যুব মেয়ে আমারী বা কত দুঃখ হতেছে তাত তিনি ভুলেও স্মরণ করেন না।"[৫৩] বিধবা মনোমোহিনী বিরহ জ্বালায় দগ্ধ হয়েছে কিন্তু তাঁর পিতা কন্যার পুনর্বিবাহে কোনো আগ্রহ দেখাননি। অন্যদিকে মনোহরী বিধবা হয়েও অনেক সংযত। মনোহরী সাত বছর বয়সে (বিধবা) রাঁড় হয়েছে বাপের বাড়িতে ভালো খেতে পরতে পায় না। তবুও মনোহারীর মনে দুঃখ নেই। মনোহরী জানিয়েছে,—"*...তথাপি দুঃখ করিনে কেননা যখন স্বামী নাই তখন আর কোন সুখের প্রয়োজন নাই...।*"[৫৪]

দাসী বামার সংলাপে বিধবা নারীর পদস্খলন ও সমাজ মানসিকতার নারকীয়তা তুলে ধরেছেন নাট্যকার,—"*তার বড় মেয়েটি দুবচ্ছর হলো রাড় হয়েছিল কিন্তু কি জানি মা কার সঙ্গে কি করে ছিল, তাতে তার পেট হয়েছিল; সেই পেট ফেলিয়ে দিয়েছে; যদি দুই এক মাসের সময় ফেলত্ তবে কোন ঝনঝটি হত না কিন্তু যখন ছয় সাত মাস হল আর ছেলেটাও পরিপাক পেলে তখন ফেলিয়েছে—এত বড় সুন্দর বেটা ছেলে দেখতে যেন কার্ত্তিক! ছেলেটি বোধ হয় জেন্ত হয়েছিল তার গলায় আবার ছুরি দিয়ে কেটেছে, কি নিষ্ঠুরের কর্ম্ম মা দেখ্লে গা থর২ করে, সেটাকে মাটিতে পুতে না দিয়া কানি কুড়োর নলবনে ফেলে দিয়েছিল—যখন বিপদ ঘটে তখন নানা রূপে ঘটে মানুষ একেবারে হতজ্ঞান হয়—সেই মরা ছেলেটাকে কুকুরে কি শিয়ালে জানি না মা ঈশ্বরই জানেন, টেনে এনে ঘোষেদের দুয়ারে ফেলে ছিল, প্রাতঃকালে চৌকিদার তাহা দেখে থানায় খবর দেয়াতে থানাদার, দারগা, জমাদার, বরকন্দাজেরা এসে একিবারে গ্রামে পুরে গেল, পাড়াশুদ্ধ লোককে ধরে টানাটানি, ভয়েতে আমরা সকলে একিবারে সসব্যস্ত হয়ে গেলুম, ঘোষেদের ধরে টানাটানি, তার পরে কত সন্ধান করতে২ জানা গেল যে চাটুয্যের মেয়ে পেট ফেলিয়েচে তাতে তাদের ঘর থানাদার লোকেরা একিবারে ঘিরে নিলে, ইদিকে থানাদারেরা ও অন্যান্য লোকেরা গোলমাল করছে উদিকে চাটুয্যে লজ্জা প্রযুক্ত উপর তালাতে গিয়ে গলায় দিয়ে মরে রয়েচেন।*"[৫৫] প্রবন্ধধর্মী এই দীর্ঘ সংলাপে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সমাজজীবনে যৌবনবতী হিন্দু বিধবা নারীদের সমাজ কলঙ্ক ও পদস্খলনকেই নাট্যকার তুলে ধরেছেন মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে।

'*বিধবা বিরহ নাটকে*' নাট্যকার সংকট চিত্র হিসাবে দেখিয়েছেন, প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই বিধবারা পদস্খলিত। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে নারীরা যৌবনে উত্তীর্ণ হয়ে নানা প্রলোভনের শিকার হয়ে সতীত্ব হারিয়েছে, কেউ বা আবার গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। সমাজের কাছে লজ্জা নিবারণের স্বার্থে গোপনে ভ্রূণহত্যা করেছে। সম্মানহানি হবার ভয়ে, লোকসমক্ষে নিজেদের

ছোট হবার ভয়ে অনেক অল্পবয়সী বিধবা নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে।

বিধবা মনোমোহিনী ও নঙ্গরা যৌবন প্রেমে ডুব দেয়। কিছুদিন পর মনোমোহিনীর গর্ভাবস্থার লক্ষণ দেখা যায়। মনোমোহিনীকে জিজ্ঞাসা করলে সে অস্বীকার করে। বিধবা মনোমোহিনী দেহসুখের উন্মাদনায় সমাজভয়কে উপেক্ষা করে নঙ্গরার সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। বিধবা কন্যার গৃহত্যাগে, সমাজ কলঙ্ক ভয়ে কুলীন বাড়ুয্যে মহাশয় স্ত্রীপুত্রসহ দেশত্যাগী হয়। দেশত্যাগী হওয়ার সময় তিনি অনুভব করেন বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা। বিধবাদের পুনর্বিবাহ না হলে ঘরে ঘরে এমনই বিপর্যয় নেমে আসতে বাধ্য। শিমূয়েল পিরবক্‌স্ এর 'বিধবা বিরহ' নাটকে স্ত্রীপক্ষীয় সমস্যার ইঙ্গিত রয়েছে। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন অনেক বিধবার সুপ্ত যৌন বুভুক্ষাকে জাগিয়ে তুলেছিল। বৈধব্য সংস্কার ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত অনেক বালবিধবা জ্বালা ভোগ করেছেন। বস্তুত বিধবা বিবাহ আন্দোলন সমস্যা সমাধান করেছে না ক্ষতি করেছে, সেই প্রশ্নই উত্থাপিত হয়েছে।

শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি রচিত '*বাল্যোদ্বাহ নাটক*' (১৮৬০) বাল্য বিবাহের কুফল দেখিয়ে রচিত।'*বাল্যোদ্বাহ নাটক*'-এর প্রস্তাবনায় নাট্যকার নট-নটীর মধ্য দিয়ে বাল্যবিবাহের করুণ পরিণতির কথা বলেছেন। উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে বাল্যবিবাহ, অসম বিবাহ সংকট-এর পথ দিয়ে সমাজে বৈধব্য সংকট জটিল আকার ধারণ করেছিল। বাল্যবিবাহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল, বৈধব্য সংকটের ঘটনা। নাট্যকার শ্যামাচরণ শ্রীমানি বাল্যবিবাহের সংকট চিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে নাট্যকাহিনীতে অকাল বৈধব্যের সংকট চিত্রকে তুলে ধরেছেন।

'বাল্যোদ্বাহ নাটকে' মায়াবতী ও বলহীন নামক ধনাঢ্য ব্যক্তির গোপাল নামক পুত্রের বাল্য বিবাহকে কেন্দ্র করে বৈধব্য সংকট চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এ নাটকে দেখা যায়, ভট্টাচার্য মহাশয় শাস্ত্রের দোহাই জানিয়েছেন,— রজঃস্বলা কন্যা কোনভাবেই অবিবাহিতা থাকবে না। যদি থাকে তবে সে বংশ নরকগামী হবে,—"*দশ বৎসরের উর্দ্ধ হোলেই কন্যাকে রজঃস্বলা বলে আর কন্যা রজঃস্বলা হোলে কি মহাপাতক্ হয় জানিস?...তোর মতে রজঃস্বলা কন্যাকে অবিবাহিতা রেখে বংশকে নরকগামী কর্ব্যে?*"[৫৬] বাধ্য হয়ে কন্যার পিতা নিজ কন্যার বিবাহ দিতে উৎসাহী হয়েছেন। অবশেষে বলহীন মৃত্যুপথযাত্রী যক্ষ্মা রোগী নবমবর্ষীয় গোপালকে বিবাহ দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে বিবাহের অল্পদিন পরেই, যক্ষ্মা রোগে গোপালের মৃত্যু হয়েছে। মায়াবতী, অম্বিকা, বলহীন, বুদ্ধিহীনের বিলাপে, অশ্রুজলে সন্তান হারানোর যন্ত্রণা প্রকাশিত হলেও গোপালের বিধবা স্ত্রী অবলার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কারণ নাবালিকা বিধবা অবলা

জানতেই পারে না যে, তার জীবনের কি পরিণতি হল। সে বুঝতেই পারে না যে তার ভবিষ্যত জীবন কতটা কঠিনতর হতে চলেছে। গোপালের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত বলহীন কোনভাবেই তার বৌমা অবলাকে তিরস্কার করতে ছাড়েনি,—"*উঃ কি অলক্ষণযুক্তা কন্যাটিকেই ঘরে এনেছিলাম যে দুমাস কালও গেলনা, আসিবা মাত্রেই অমনি সংসার তিলক স্নেহাস্পদ পুত্রটীকে গ্রাস কোল্যে; ঘটক বেটা কি দুর্দান্ত রাক্ষসীর সহিত আমার প্রিয় বালকের সম্বন্ধ ঘটালে।*"[৫৭]

অসুস্থ বলহীন মৃত্যুপথযাত্রী পুত্রের যক্ষ্মারোগ গোপন রেখে বিয়ে দেয় অবলার সঙ্গে। অপরদিকে অবলার পিতা বুদ্ধিহীন পুণ্যের খাতিরে নিজ কন্যাকে যক্ষারোগীর হাতে তুলে দেয়। গোপালের মৃত্যুতে নিরীহ মেয়েটিকে অযথা রাক্ষুসী বলে তিরস্কার করতেও ছাড়েনি। পুত্রবধূ শিশুকন্যার প্রতি শ্বশুর বলহীন জানিয়েছে,—"*উঃ কি অলক্ষণযুক্ত কন্যাটাকেই ঘরে এনেছিলাম যে দুমাসও গেল না, আসিবা মাত্রেই অম্‌নি সংসার তিলক স্নেহাস্পদ পুত্রটিকে গ্রাস কোলে; ঘটক ব্যাটা কি দুর্দান্ত রাক্ষসীর সহিত আমার প্রিয় বালকের সম্বন্ধ ঘটালে।*"[৫৮] প্রতীকে রূপকে নাট্যকার যেন বলতে চান, কৌলিন্য বংশ গৌরব ক্রমশ যেন বলহীন হতে বসেছে। কৌলিন্য গর্বে গর্বিত পিতা বাল্যবিবাহের কুফল না জেনে যদি পুত্রের বিবাহ দেন তাহলে তাঁর পুত্রকে অকালে হারাতে হবে। অন্যদিকে বিদ্যাহীন, পিতা শিশুকন্যাকে বিয়ে দিয়ে বিপদের দিকে কন্যাকে ঠেলে দিলে, কন্যা দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছে।

'দলভঞ্জন' (১৮৬১) নাটকে প্রত্যক্ষ ভাবে বিধবা নারীর সংকট চিত্র উপস্থাপিত না হলেও বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে সমাজে দুই দল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়ার কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। এ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায়, বকুলতলার পুষ্করিণীতে গৃহস্থ রমণীরা বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ নিয়ে তর্ক করেছে। তাঁদের কথায় উঠে এসেছে বিধবা সংকট ও পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ। বিমলা, মালতী, রাধামণি, তারামণি ও ছোটবধূ প্রভৃতি মহিলারা বকুলতলায় পুষ্করিণীর সামনে দাঁড়িয়ে বিধবা-বিবাহ নিয়ে তর্কে-বিতর্কে ব্যস্ত থেকেছে।

হরিশচন্দ্র মিত্র বিধবা বিবাহের সমর্থনে *'শুভস্য শীঘ্রং'* (১৮৬১) ও *'ম্যাও ধরবে কে'* (১৮৬২) দুটি নাটক রচনা করেন। এই দুটি নাটকে উঠে এসেছে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ ও বিধবা নারীর সংকট চিত্র। শশাঙ্কমোহন সমাজ অনুশাসনের ভয়ে বিধবা কুমুদিনীকে বিবাহ করতে অসম্মত হয়েছে এবং পালিয়ে গেছে। শশাঙ্কমোহনের পত্রসূত্রে জানা যায়, অভিভাবক, স্বদেশ ও স্বজন ও সমাজের ভয়ে সে বিধবা বিবাহ হতে বিরত থেকেছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে, কমলিনী, কুমুদিনী, সরলা, কামিনী প্রমুখের সংলাপের মধ্য দিয়ে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে উপস্থাপিত

হয়েছে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে, বিধবা কুমুদিনীর পুনর্বিবাহ সম্পর্কিত মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। কুমুদিনীর স্বগত ভাষণে বৈধব্যের অর্ন্তজ্বালা প্রকাশ করেছে এভাবে,—''*হা অবিবেকি বিধাতঃ! তুমি কি নিদারুণ বৈধব্য যন্ত্রণানলে নিয়ত দগ্ধ করবে বলে এদিকে এরূপ সদ্‌গুণ সম্পন্না করে সৃষ্টি করেছিলে?*''[৫৯]

'ম্যাও ধরবে কে?' নাটকে বিধবা কামিনী, কমলিনী ও সরলার কথোপকথনে উঠে এসেছে বৈধব্যের সংকট চিত্র,—

''*কমলিনী ।। ভাবনা কি ভাই কিছুদিন সবুর কর, 'সবুরের গাছে মেওয়া ফলে।'*

কামিনী ।। আর মেওয়া ফলে। কথায় বলে "থাক কুকুর তুই আমার আশে'' ভাত দেব তোকে পোষ মাসে খাবি তুই গাসে গাসে'' আমাদের ভাই আর কি।

কমলিনী ।। কতজন বিধবা বিয়ের সাপক্ষে জুটেছে জানত?

কামিনী ।। জানবো না উকন? ঢাকা প্রকাশকে কদিন ত স্বাক্ষর করে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাঁদের ঘরে কত বিধবা অবিরত চোক্ষের জলে ভেসে যাচ্ছে তবু তাদের বিয়ে দেবার নামটি নাই। তারই আবার এ সভায় ও সভায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা কর্ত্তব্য বলে গালবাদ্যি-মর কি বলে বক্তৃতা করে ফেরেন। হায়! ঠিক লজ্জাও পায় না।

সরলা ।। (স্বগত) কামিনী বেশ বলেছে!

কুমুদিনী ।। অনেক দিন হতে এ দেশে বিধবা বিবাহের রীতি উঠে গিয়েছে; পুনরায় সেই রীতি প্রচলিত করতে হলে অনেক যত্ন সময়ের আবশ্যক করে।

কামিনী।। কত সময় চাই? এক যুগ নাকি? তুমিও যেমন বুন, নব্য সম্প্রদায়ের কেবল মুখ সর্বস্ব, ওঁরা মুখেই যত 'হাতি মারেন ঘোড়া মারেন' কাজের বেলায় কিছুই না। দেখ ভাই, ওঁরা মুখে যেরূপ বলে ফেরেন, কাজেও যদি সেইরূপ করেন, তাহলে বঙ্গ দেশের দুরবস্থা কদিন থাকে? তার সাক্ষী দেখ কেন্ না বা কি আমার বিয়ে দিতে পারেন না, তিনি সাহস করে তা দেবেন না কেবল স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা বাড়াবেন...দূর কর, এসব কথা আর উঠিও না বলতে গেলে অনেক হয়। চুপ করে থাকাই এক প্রকার ভাল। কথায় বলে বোবার শত্রু নাই।''[৬০]

বিধবা কুমুদিনী, কামিনী, সরলা প্রমুখ বিধবা বিবাহ তথা পুনর্বিবাহ করতে চাইলেও সমাজ তা স্বীকার না করায়, সমাজ ও অদৃষ্টকে তাঁরা দোষারোপ করেছে। বৈধব্য জীবনকে জীবনের ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছে। এ নাটকে ঠানদিদির সংলাপে নাট্যকার বিধবা বিবাহ নিয়ে এই গভীর আক্ষেপ উক্তি করেছেন,—''*কতদিনে এদেশে বিধবাবিবাহের চলন হবে?*

কতদিনে এ দেশের বিধবারা বৈধব্যযন্ত্রণা হতে নিস্তার পাবে?"[৬১] নাট্যকার বলতে চেয়েছেন, দেশাচারই বিধবা বিবাহের প্রধান বাধা স্বরূপ ও সমাজ সংকটের মূল।

কুশদেব পালের *'আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটকে'* দেখা গেছে নয় বছরের বিধবা কাদম্বিনী যৌবন তাড়নায় নাপেতানীর সাহয্যে রমণীমোহনের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে। নাটকের ঘটনাসূত্রে দেখা যায় শুধুমাত্র ভোগলিপ্সায় বিধবা বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে, একরকম রক্ষিতা করে রমণীমোহন কাদম্বিনীকে ভোগ করেছে। কামিনীর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে গৃহত্যাগের অল্পকিছুদিন পরেই। রমণীমোহনের অভিসন্ধি সিদ্ধ না হওয়ায়, কাদম্বিনীকে শুধুমাত্র অন্নবস্ত্র দেওয়ার কথা স্বীকার করে সে। মাসিক ৩ টাকা দিয়ে রমণীমোহন কাদম্বিনীর প্রতি দায়িত্ব পালন করবে বলে জানায়। কাদম্বিনী কুলমান খুইয়ে রমণীমোহনের হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সেই রমণীমোহনই যখন কাদম্বিনীর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তখন কাদম্বিনীর দুঃখ অপরিসীম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাদম্বিনীর ভাগ্য বিড়ম্বনা কাদম্বিনীকে নিস্তার দেয়নি। সে না পেয়েছে শ্বশুর ঘর, না পেয়েছে বাপের ঘর। কাদম্বিনী জানিয়েছে ,—"*(রোদন করিতে ২) মাসি গো আমার দুঃখের কথা কি বল্‌ব, বিয়ে হতে না হতে শ্বশুরের কুল খেয়েছি, জ্ঞান হতে না হতে বাপের কুল খেয়েছি, যদি বা এককুল ধরে পার করেছিলাম তাও খেলেম গা,...।*"[৬২] প্রতিবেশী জগদম্বার পরামর্শে ভাগ্যবিড়ম্বিত কাদম্বিনী উকিলের দ্বারস্থ হয়। উকিলের পরামর্শমত কাদম্বিনী দেওয়ানীতে নালিশ করে। দেওয়ানীতে নালিশের আরজীর মুসাবিদা অনুযায়ী কাদম্বিনী রমণীমোহনের কাছেপ্রতিমাসে দশ টাকা করে মাসিক খরচের দাবী করে। কিন্তু তাতেও কোন সুরাহা হয়নি। নাট্যকার কুশদেব পাল, কাদম্বিনীর সংকটময় অবস্থার বর্ণনায় লিখেছেন,—

"*হল ক্লেশ তনু শেষ, তবু তায় ধায় রে।*
ক্ষান্ত নাহি হয় মন, হায় হায় হায় রে।।"[৬৩]

বিধবা হয়ে পরকীয়ায় সর্বস্ব হারানো কাদম্বিনীর পরিণাম অত্যন্ত দুঃখজনক। নাট্যকার কুশদেব পাল, বিধবা কাদম্বিনীর পরিণতির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের ভয়ঙ্কর সংকটটি তুলে ধরেছেন।

গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'পুনর্ব্বিবাহ'* (১৮৬২) নাটকে দেখা যায় নারীর ঋতুমতী হওয়ার পর স্বামী দ্বারা পুনঃগ্রহণের উৎসব। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে পাড়া-পড়শির, বিবাহিত -অবিবাহিত মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। বঞ্চিত হত শুধুমাত্র বিধবা নারীরা। কারণ বিধবাদের অমঙ্গলের দ্যোতক হিসাবে দেখা হত। দূর থেকে বিধবা রমণীরা এধরণের অনুষ্ঠান দেখতেন এবং মনে মনে আক্ষেপ করতেন। এ নাটকে দেখা গেছে আর এক সংকট চিত্র, বিধবা

নারী বিলাসবতী স্বামীর অবর্তমানে একাদশী পালনে অরুচি প্রকাশ করেছে। কারণ জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবার পূর্বেই সে তার স্বামীকে হারিয়েছে। স্বামী তাঁর কাছে এক শৈশবের ঝাপসা স্মৃতি। তার মনে প্রশ্ন জাগে, স্বামী মানেই যদি একাদশীর নির্জলা উপবাস, বিবর্ণ সাদা কাপড়, তেলহীন শুষ্ক চুল, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে প্রবেশের বাধানিষেধ তাহলে সে স্বামীকে কেন স্মরণ । বিলাসবতী জানিয়েছে,—''*এই যে আমার ভাতার বের হল্‌দে কাপড় না ঘুচতে ঘুচতেই পটল তুললো, তা কি করবো বল? এ বলে কি দিবারাত্রি কেঁদে কেঁদে শরীর খোয়াব।*''[৬৪]

যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের *'বিধবাবিলাস'* নাটকে, সুমতি, সুনীতি, সাবিত্রী, সুশীলা, সতী, পতিব্রতা প্রমুখ একাধিক বিধবার সংকটের কথা উঠে এসেছে। আবার, এ নাটকে বিলাসিনী, রঙ্গিনী, কাঞ্চনী, রসবতী প্রমুখ পদস্খলিত গর্ভবতী বিধবাদের সংকটের কথা বলা হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই অল্পবয়সী বিধবা। একাদশীর নির্মমতায় এরা পীড়িত, জর্জরিত। সুমতি ও সুনীতি কুলপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি এলে তাঁর স্ত্রী নিজ কন্যাদের দুরবস্থা ব্যক্ত করে। সুনীতি ও সুমতি তাদের নিজ জীবনের বৈধব্য যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করে। বিধবাদের ক্ষুধার কষ্ট বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহিণীর কাছে দুঃসহ লাগে,—

"দয়াহীন বিধাতার কপালে আগুণ।
আহামরি ক্ষুধায় হতেছে সবে খুন।।
ইচ্ছা করে প্রাণ ভরে আহার করাই।
কি করিব হায়২ উপায় যে নাই।।
আমার চারিটি মেয়ে যেন স্বর্ণলতা।
সাবিত্রী সুশীলা সতী আর পতিব্রতা।।
একেবারে চারিটির পুড়েছে কপাল।
গতমাসে জামায়ের হইয়াছে কাল।
শেষে পুত্রবধূ দেখে ছিল যেই সুখ।
বিধাতা তহাতে পুনঃ করেছে বিমুখ।।"[৬৫]

কুলীন ব্রাহ্মণদের হাতে কন্যা সমর্পণ করতে পারলেই যেন সমস্ত পুণ্যপ্রাপ্তি হয়। যার ফলে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বিবাহের পাত্র হিসাবে সমাজে গণ্য। এমনকি মৃত্যু পথযাত্রী কুলীন ব্রাহ্মণও পাত্র হবার যোগ্য। পুণ্য অর্জনকারী কন্যার পিতা একবার ভেবেও দেখেন না যে তাঁর বিধবা কন্যার ভবিষ্যৎ কি হবে। বালিকা অবস্থায় যার বিবাহ এবং বিবাহের কিছুকাল পরেই

বৈধব্য যন্ত্রনার নরকবাস। যে বয়সে একটি বালিকার খেলার সঙ্গী পুতুল, তার অজান্তেই সমাজ তার কপালে সঙ্গী হিসাবে জুড়ে দেয় বৃদ্ধ বর। নবজীবনের বিবাহের পরবর্তী অধ্যায় সঙ্গী হয় কঠোর একদশী ব্রত। অর্থাৎ বৃদ্ধ বরটির আয়ু পৃথিবী আর বহন করতে না পারায় বালিকাটি সাদা থান পরিহিত হয়ে, নিরামিষ আহারে একদশীর ব্রত পালনে, পুজোর ঘরে ঠাকুর সেবায় জীবন অতিবাহিত করে। বিধবা কন্যাটির সধবা মায়ের প্রাণে মৃত্যু যন্ত্রণা অনূভূত হয়, নিজ প্রাণপ্রিয় কন্যার শুষ্ক মুখ দর্শনে। *'বিধবাবিলাস'* নাটকে দেখা যায়, যৌবনতৃষ্ণায় কুলবালা ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হয়েছে। ষোল বছর বয়সে সাবিত্রীর এক কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে হয়। সর্প দংশনে এক বৃদ্ধের আয়ুক্ষয় ঘটে। কুলপ্রদীপ মুখোপাধ্যায় পুণ্য অর্জনের স্বার্থে ব্যস্ত হয়ে তাঁর অপর তিনটি কন্যাকে সেই মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দেন। ফলস্বরূপ তাঁর চারকন্যা অল্পদিনেই বিধবা হয়। পাঁচ বছর বয়সী কনিষ্ঠা কন্যার পতিব্রতার বৈধব্য দশা নিতান্তই অসহ্যকর হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে দেখা যায়, কামের দহন বিধবা রমণীদের অভিশাপ স্বরূপ। কামানলে দগ্ধে জীবন যাতে অতিবাহিত করতে না হয় তাই তাঁরা বিদ্যাসাগরের কাছে এর বিহিত চেয়ে পত্র পাঠিয়েছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উকিল হয়ে বিধবাদের মনের কথা অনুভব করতে পারেন। এই বিশ্বাসে বিধবারা জানিয়েছে,—

'' আমরা বালিকা সতী, মিনতি প্রণতি স্তুতি,
করিতেছি পতির কারণে।।
শুন শুন মহীপতি, বিধবার দিয়া পতি,
কর কর দেশ উপকার।
থাকিবে তোমার নাম, আমাদের মনস্কাম
পূর্ণ করি লও নমস্কার।।''[৬৬]

বিধবা নারী একটি মৃত স্বামীর কারণে সারাজীবন কষ্ট করে। আশা আকাঙ্ক্ষা লোভ শখ সবকিছু বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র ঈশ্বরের চরণে নিজেকে সঁপে দেয়। আজীবন অপুষ্ট একাদশী পালনে দেহ জীর্ণ হয় ঠিকই কিন্তু বয়োসচিত যৌবন ধরা দেয় ওই অসহায় স্বামীহারা রমণীদের। পুরুষসঙ্গ লোভে অচিরেই তারা ব্যভিচারিণী, কুলত্যাগী, ভ্রূণ হত্যাকারিনী, পাতকিনী ও বেশ্যাজীবী বলে সমাজে পরিচিতি লাভ করে। রাজার হৃদয় এইসকল বিষয় অবলোকন করে ব্যথিত হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রীর বক্তব্য অনুসারে বিধবাদের সর্বসুখে বঞ্চিত করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম। তাই তাদের দুঃখে

কাতর হওয়া উচিৎ কাজ নয়। বিধবাদের অধিকতর কষ্ট প্রদান উচিত। তাদের দুঃখ প্রদানে অধর্ম নেই।

সুমতি, সুনীতি, সাবিত্রী, কুলবালা, সতী, সরলতা, সুশীলা প্রত্যেকেই রাজসভায় নিমন্ত্রণ পেয়ে রাজসভায় উপনীত হয়েছে। রাজসভায় তারা উপস্থিত হয়ে তারা তাদের সারাজীবনের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার কথা জানিয়েছে। তারা মনে করেছেন, বিধবা হয়ে সারাজীবন জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে মৃত স্বামীর সঙ্গে সতী হওয়া অনেক শান্তির,—

''পূর্ব্বেতে বিধবাদলে, অস্বামিক বস্তু বলে,
পোড়াইত জ্বলন্ত আগুনে।
সে পোড়া যে ছিল ভাল, পুড়িতেছি চিরকাল,
—আগুণে শতগুণে।''[৬৭]

বিধবা রঙ্গিনী ও বিলাসিনী গর্ভবতী। যৌবনের অদম্য টানে তারা কুপথে পা বাড়িয়ে পদস্খলিত। রঙ্গিনী আক্ষেপ করে জানিয়েছে,—''*...দিন কতক আগে যদি বাবা আমার বিয়ে দিত তাহলে কি এমন হয়। এখন ভেবে ভেবে অস্থিচর্ম্ম সার হল।*'[৬৮] গর্ভবতী বিধবাদের দাবী হল বিধবা বিবাহ দেবার আগে তাদের গর্ভজাত সন্তানদের রক্ষা করতে হবে। বিধবা রমণীদের যৌবন তাড়িত জীবনে গর্ভবতী হওয়া ও আত্মসম্মান রক্ষার্থে ভ্রূণ হত্যা—এসবই সহায় সম্বলহীন বিধবা রমণীদের ললাট লিখন। তাই গর্ভবতী রমণীদের গর্ভস্থ সন্তান যাতে রক্ষা পায়, নিরাপদ থাকে সেই আর্জি ও প্রার্থনা নিয়ে রাজার কাছে তারা এসেছে। বিধবাদের বিবাহ দিতে উদ্যোগী রাজার কাছে প্রার্থনা নিয়ে এসেছে যাতে তারা ভ্রূণ রক্ষা করতে পারে,—''*মহারাজ! আমাদের প্রার্থনা বিবাহ দেবার পূর্বে সন্তান রক্ষার উপায় হয়।*'[৬৯] স্বামীহীন সন্তান ধারণের ফলে বিধবা রমণীদের উপহাসের পাত্রী হতে হয় মন্ত্রীর কাছে। শুধু মন্ত্রী নয়, সমাজে নানান লোকের হাসির খোরাকে পরিণত হয় তারা।

'বিধবাবিলাস' নাটকে দেখা যায় শ্রীবিলাসী যে লিখিত আবেদন পেশ করেছে, সেখানে দেখা যায় শ্রীবিলাসী বিধবার পুনর্বিবাহে রাজী নয়। সে শুধুমাত্র যৌবন দহে দগ্ধ হয়ে নারীরা যে পাপকার্যে লিপ্ত হচ্ছে সেটা যাতে আর বৃদ্ধি না হয় সে ব্যাপারে রাজামহাশয়কে অবগত থাকতে বলেছেন। গর্ভজাত সন্তান যাতে পৃথিবীর আলো দেখতে পায় অকালে যাতে চলে যেতে না হয়, রাজামহাশয় এ বিষয়টিকে যেন হুকুম তামিল করেন। গর্ভবতী রঙ্গিনী শুধুমাত্র তার গর্ভস্থ সন্তানের সুরক্ষা চেয়েছে,—

"সন্তানের প্রাণ কর অগ্রে দান, পশ্চাতে দিও হে পতি।"[৭০]

বিধবা কাঞ্চনীর বিধবা বিবাহে প্রবল আপত্তি। আটমাসের গর্ভবতী কাঞ্চনী জানায় যে, যদি সে গর্ভপাত না করে তাহলে গৃহচ্যুত হবে এবং গর্ভপাত করলে ইংরেজ আইন অনুসারে সাত বৎসর জেলে যেতে হবে। তাই যাতে সন্তান রক্ষার আইন প্রণয়ন হয় তার দিকে সর্বপ্রথম দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। গর্ভস্থ ভ্রূণ রক্ষার্থে নতুন আইন প্রণয়ন করার পর বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করবার আর্জি জানিয়েছে। রসবতী তার আবেদনপত্রে জানিয়েছে, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হলে যেন তার মধ্যে 'নিকা' নামক মুসলিম বিবাহ রীতিটি থাকে। কারণ কুলতিলক মুখোপাধ্যায়ের ব্রাহ্মণ কন্যা রসবতী তাদের বাড়ির মাইনদার করিম শেখকে উপপতি রেখেছে। রসবতী তার প্রতি প্রণয় আসক্ত ও অনুরক্ত। দুর্ভাগা বিধবারা যৌবনাবস্থায় ধর্মপথে লৌকিক ও পারলৌকিক সুখে বঞ্চিত হয়ে যেভাবে কালযাপন করে তা অবর্ণনীয়। বিধবা রমণীরা আজীবন কষ্ট সহ্যের মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করে জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেয়। পরলোকের চিন্তায় ব্রহ্মচর্য পালনে দেহও মন অবিচার করলেও সমাজনিয়ম মান্য করতে তারা বাধ্য হয়েছে।

রামনারায়ণ তর্করত্নের সমাজ সমস্যামূলক নাটক *'নব-নাটকে'* (১৮৬৬) উঠে এসেছে বিধবা নারীর সংকট চিত্র। *'নব-নাটকে'* চপলার উক্তিতে বিধবাদের দুর্দশার ছবি পাওয়া যায়,

— *"দন্তহীন মুখ সম নারী পতিহীনা।*
অন্যে অধিকার নাই শুধু জল বিনা।।"[৭১]

'বিধবা বিবাহ' সমাজে চালু না হলে, বিধবা নারীর জন্য পূর্বের 'সহমরণ' প্রথাই সুখকর এমনটা মনে হয়েছে অনেক বিধবা নারীর। *'নবনাটকে'* সুধীর মনে করেছেন,—বৈধব্য দাবানলে নিশিদিন দগ্ধ হবার চেয়ে বিধবা মেয়েদের পক্ষে পূর্ব্বে (র) সহগমন প্রথাই মঙ্গলকর ছিল। সুধীরের সংলাপে নাট্যকার বিধবা নারীর সংকটের চিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকার,—*"ঐ একটি স্বামীর মৃত্যু হলে ঐ ৫০।৬০ টী স্ত্রী সকলেই বিধবা হলো, বৈধব্যবেদনা তো সহজ নয়, পূর্ব্বে সহগমন প্রথা ছিল এক্ষণে তা নাই, বিধবা বিবাহও সাধারণে চলিত হয়ে আজও ওঠে নাই; ঐ ৫০।৬০ টী স্ত্রীর দেহ বৈধব্য দাবানলে যে দিবানিশি দগ্ধ হতে লাগলো।"*[৭২]

কেউ কেউ বা শ্বশুরবাড়ীতে অবহেলায় পড়ে থাকত। দুবেলা পেট ভরে খাবারও জুটতো না। আর কেউ বা শ্বশুরবাড়ীতে সতীনের জ্বালায় অতিষ্ঠ। তবুও নারীর পতিই হয় গতি। স্বামীই যেন একটি নারীর কাছে পরম আপনজন। একজন স্ত্রীর সমস্ত সুখই যেন তার স্বামী। যে নারী স্বামীহারা তার চেয়ে অভাগিনী এই ত্রিসংসারে নেই।

'নবনাটক' এ রামনারায়ণ তর্করত্ন মূলত দেখাতে চেয়েছেন যে বহুবিবাহের ফলে নারী জাতির যে সংকট উপস্থাপিত হয়েছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। একজন সতীসাধ্বী স্ত্রী জীবনের একপ্রান্তে এসে তার স্বামীকে ভাগ করে নিয়ে যম যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়েছে। আবার অন্যদিকে কুড়ি-তিরিশটি বিবাহের ফলে, রমণীরা অকালেই বৈধব্য নিয়মাচারে বদ্ধ হয়েছে। এ নাটকে বিধবা নির্ম্মলার সংকটের মধ্য দিয়ে তার অভিব্যক্তি পাই। *'নবনাটক'*টি বহুবিবাহ কেন্দ্রিক হলেও এ নাটকে বৈধব্য সমস্যা প্রধান বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে।

দীনবন্ধু মিত্রের *'বিয়ে পাগলা বুড়ো'* (১৮৬৬) নাটকে রামমণি ও গৌরমণি এই দুই বিধবা চবিত্রের সংকট উপস্থাপিত হয়েছে। রাজীব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রামমণি ও গৌরমণি দুজনেই বালবিধবা। বার্দ্ধক্যে উপনীত পিতার পুনর্বার বিবাহ করবার ইচ্ছায় বিধবা রামমণি আহত হয়েছে। বৃদ্ধ পিতার পুনর্বিবাহের ইচ্ছায় রামমণি ও গৌরমণি ভেবেছে, তাদের পিতাকে যে কন্যাই বিবাহ করুক, অকালেই তাকে বৈধব্য জীবনে উপনীত হতে হবে এবং একাদশীর ব্রত পালন করতে হবে। রামমণি আক্ষেপের সঙ্গে জানিয়েছে,—*'' তার বুঝি মা নেই, তা থাকলে কি এমন বুড়ো বরকে বিয়ে দেয়। একাদশীর জ্বলন্ত আগুনে কাঁচা মেয়ে ফেলে!'*[৭৩] বোঝা যায় সেকালে ক্ষেত্রবিশেষে পারিবারিক নিঃসহায়তা অনেক সময় নারীর সংকটকে অনেক অংশে ত্বরান্বিত করেছিল।

অন্যদিকে বিধবা গৌরমণি বলেছে,—*''দিদি! ভাল খেতে ভাল পত্তে, ভাল করে সংসারধর্ম্ম কত্তে কার না সাধ যায়?''*[৭৪] মনের সুপ্ত বাসনার কাছে হার মেনে গৌরমণি পুনর্বার বিবাহ করতে চায়। কিন্তু সমাজের বিধিনিষেধের কাছে মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করা অসম্ভব জেনে গৌরমণি বলেছে, বিধবা হবার চেয়ে সহমরণ প্রথা-য় নিজেকে পুড়িয়ে ফেলা অনেক ভালো ছিল। কারণ প্রতিদিন একটু একটু করে মরবার চেয়ে একেবারে মৃত্যু হওয়া শ্রেয়। গৌরমণির দুঃখে কাতর হয়ে বিধবা রামমণি আক্ষেপের সঙ্গে বলেছে,—*'' আহা! যিনি সহমরণের পদ্যি উঠিয়ে দিলেন, তিনি যদি বিধবা বিয়ে চালিয়ে যেতেন তাহলে বিধবাদের এত যন্ত্রণা হত না।''*[৭৫] রামমণি ও গৌরমণির কথোপকথনে প্রকাশিত হয়েছে বৈধব্যের আর্তি, বেদনা ও যন্ত্রণার আবিলতাময় করুণ দুঃখসার। উভয়ের কথোপকথনে বৈধব্যের আর্তি গভীর মনস্তাত্ত্বিকতায় চিত্রিত করেছেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র,—

'' গৌরমণি ।। যেদিন পতি মলেন সেদিন মনে করেছিলেম, আমি প্রাণকান্ত বিরহে একদিনও বাঁচবো না; আর প্রতিজ্ঞা কল্লেম অনাহারেই মরবো—কিন্তু

সময়ে শোকে মাটি পড়ে, এখন আর আমার সে ভাব নাই—আমি কি নিষ্ঠুর,যে পতি আমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসতেন, আমি সেই পতিকে একেবারে বিস্মৃত হইচি!

রামমণি ।। *অনেক সময় মেয়ে দ্বিতীয় বিয়ে না হতে বিধবা হয়েচে, তারা স্বামী কখন দেখেনি, তাদের বিয়ে দিলে দোষ কি?*

গৌরমণি।। *ছোট মেয়েটিই কি, আর বড় মেয়েটিই কি, বিধবা বিয়েতে দোষ নাই। বিধবার বয়স চলে গেলে কেউ বিয়ে করবে, কেউ করবে না, এখন পুরুষদের মধ্যেও তো অমনি আছে, মাগ মলে কেউ বিয়ে করে, কেউ বিয়ে করে না, কিন্তু তা বলে তো এমন কিছু নিয়ম নাই যে এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে না। সকল দেশে বিধবা বিয়ের রীতি আছে, সেকালে কত বিধবা বিধবা বিয়ে হয়েচে—সব লোক মূর্খ, কেবল আমার বাবা আর কলকাতার বলদ পঞ্চানন পন্ডিত!*"[৭৬]

উনিশ শতকের সমাজব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে একজন কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা বাল্য বয়সেই কন্যার সম্বন্ধ করে থাকতেন। কন্যার প্রথম বিবাহ হলে তাকে স্বামীর ঘরে পাঠানো হত না। বাল্যবয়সে বিবাহের পর কন্যাটি তার পিতা মাতার কাছেই বড় হত। বয়সোচিত ধর্মে কন্যাটি রজঃস্বলা হলে তাকে পুনরায় তার স্বামীর সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হত। কিন্তু অনেকসময় বাল্যাবস্থায় বিবাহের পর বালিকাটি তার স্বামীর বিষয়ে অজ্ঞাত থেকে যেত। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে তাকে বিধবার আচার আচরণ পালন করতে হত। যে মেয়েটি বিবাহ শব্দটির অর্থ বোঝে না, 'স্বামী' শব্দটির সঙ্গে পরিচিতি ঘটলো না, স্বামীকে কোনোদিন চোখেও পর্যন্ত দেখলো না, সেই কন্যাটির বাল্যকাল ও যৌবনকাল ধ্বংস হয়ে যায় বৈধব্যদশার নিয়মনীতির মধ্য দিয়ে।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের *'মেঘনাদবধ নাটক'* (১৮৬৭) পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর রচনা। এ নাটকে উঠে এসেছে প্রমীলার বৈধব্য সংকটজনিত আশংকার কথা। প্রমীলা তাঁর স্বামী ইন্দ্রজিৎকে হারিয়ে আশঙ্কিত হয়েছেন। মন্দোদরী বৈধব্য সংকটের বেদনা সম্পর্কে পুত্রবধূকে সচেতন করিয়ে দিয়ে বলেছেন,—

'' অবলার পতি সম নাহি অন্য ধন।

না প্রকাশি পতি পাশে কি আছে বেদন।।

পতির চরণ, করি হৃদয়ে ধারণ,

নাশি দুঃখ অনুক্ষণ।" [৭৭]

আবার 'মেঘনাদবধ নাটকে' ইন্দ্রজিৎ মারা যাবার পর প্রমীলা বৈধব্যের যন্ত্রণার করুণ অনুভব ব্যক্ত করে শাশুড়ী মন্দোদরী জানিয়েছে,—"*আর্য্যে! ভেবে দেখুন বিধবা কন্যা আর বিধবা পুত্রবধূর মরণই ভাল। তাদের দেখলে জামাই ও পুত্রের শোক প্রতিদিন নতুন করে্য জ্বল্‌তে থাকে। যখন আমি উপবাসে কাতর হয়্যে শুষ্ক মুখে আর শুষ্ককণ্ঠে প্রাণ পতির উদ্দেশে রোদন কোরবো তখন তুমি কি তোমার মেঘনাদের জ্বালা ভুলবে।...আর্য্যে! প্রণাম করি, আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্মান্তরে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ না করি।*"[৭৮] এভাবেই পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে সমকালীন বিধবার সংকট চিত্রের করুণ আর্তি ধরা দিয়েছে।

১৮৬৮ সালে প্রকাশিত হয় হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *'বঙ্গকামিনী'* নাটক। এ নাটকে দেখা যায় কামিনীর পিতা গদাধর বিদ্যাবাগীশ চান, যেকোনো পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিয়ে মুক্তি পেতে। গদাধর বিদ্যাবাগীশের বন্ধু মুকুন্দরাম তর্কালঙ্কার জানিয়েছে,—"*আরে রেখে দ্যাও হে, মনোমত আর অমনোমত! যাতে তাতে ঘর থেকে বার্ কোত্তে পাল্লেই হোলো। ওগুলো জন্ম্যে কেবল চিরকালটা বাপ মাকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মারে বইত নয়।*"[৭৯] *'বঙ্গকামিনী'* নাটকে দুজন বিধবা চরিত্র রয়েছে,—'রঙ্গিনী' ও 'মোহিনী'। বিধবা হবার পর বাপের বাড়িতে এসে রঙ্গিনী দিনের পর দিন ফাই ফরমাস খেটে মরেছে। রঙ্গিনীর কপালে জুটেছে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য , —"*এই ভাই, আমি রাঁড় হোয়েচি, দুব্যালা খাওয়া ঘুচে গেছে; এক সন্ধ্যে পোন কুন্‌কে চাল, তাতেও না বলে এমন বাক্যি নেই। আমি ভাই, পরণে কখন ভাল কাপড় পরিনি, ভেয়েদের ছেঁড়া খোঁড়া, যা ফেলে দ্যায়, তাই দুখান চেয়্যে পোরি, তাতেও কারও মন যুগিয়ে চোল্‌তে পারিনি।*"[৮০] রঙ্গিনীর মত বিধবা মোহিনীকেও আমরা এ নাটকে দেখতে পাই। রঙ্গিনী ও মোহিনী দুজনেই অনেকদিন হল বিধবা হয়েছে। তাই তাদের বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করা অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে। তারা মনে করে স্বামী যেমনই হোক এয়োস্ত্রী হয়ে মাছভাত খেয়ে বেঁচে থাকলেও জীবনে অনেক সুখী হওয়া যায়। একাদশীর দহন ও বৈধব্যজ্বালায় সারাজীবন দহন হওয়ার চেয়ে স্বামীর লাথি ঝ্যাঁটা খেয়ে বেঁচে থাকাও অনেক সুখকর,—"*রাঁড় হওয়ার চেয়ে কি যন্ত্রণা আর আছে? আমরা অনেক দিন রাঁড় হোয়েচি—দুঃখু সওয়া আমাদের অভ্যেস হয়্যে গেছে; দুঃখে আর আমাদের দুঃখু বোধ হয় না; কিন্তু তবু একাদশীর দিন মনে করে্য দ্যাখো দিকি, কেমন পেডার হয়! আহা!*

আমার মাস্‌তুতো বোন্‌টি আর বচ্ছর ফাল্গুন মাসে রাঁড় হোয়েছে। যেই সে রাঁড় হোলো, অমনি তার শ্বশুরও তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে। বাপের বাড়িতে রাঁড় মেয়ের যত সুখ তাতো জানো, এক ব্যলা দুটো ভাত, তাতেও বাপ মায় কত মুখ ঝাঁটকান দেন! আহা ভাই! আমার সে কথা হল্যে বুক ফেটে যায়! সেই ছেলেমানুষ সবে বার বছরে পোড়েছিল, তখন কি তার একাদশী কর্‌বার সময়! (দীর্ঘনিশ্বাস) আহা একাদশীর দিন হল্যে ছট্‌ পট্‌ কোল্লে কি হবে! ফের অমন করবি তো ঝ্যাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেবো, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দাস্যবিত্তি কর্‌্যে খাবি।...কতক দিন আমি তাদের বাড়িতে ছিলেম, একাদশীর দিন হোল্যে সর্ব্বদা তাকে তেল মাখাতেম, আর তার মাথায় জল ঢাল্‌তেম। কিন্তু তাই, যার অন্তরে আগুন জ্বোল্‌চে, তার বাইরে জল ঢাল্লে কি হবে?... তাই আমি বোল্‌চি, রাঁড় হওয়ার চেয়ে যন্ত্রণা আর নেই।"[৮১] অর্থাৎ বোঝা যায়, সেকালে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীন অসহায় মহিলারা দুবেলা দুমুঠো ভালোমন্দ খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য স্বামী সঙ্গকে কাঙ্খিত মনে করেছেন।

১৮৬৮ সালে প্রকাশিত হয় বিপিনমোহন সেনগুপ্তের *'হিন্দু মহিলা নাটক'* । এ নাটকে দেখা যায়, নটবর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা মনোরমার বিবাহ উপলক্ষে বিধবা গোলাপীর প্রশ্ন,—*''হ্যাঁগা মনোরমার বিয়ে, মনোরমার বয়েস কি, যে বিয়ে দেবে।"*[৮২] বিধবা গোলাপীর মন বাল্যবিবাহের বিপক্ষে। কিন্তু গোলাপীর বিধবা বোন সুমতি সাত বছরের মেয়ের বিয়েতে আশ্চর্য নয়। সে অনায়াসে বলে, তিন চার বছর বয়সের মেয়েদের ও বিবাহ খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সাত বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে নটবর বন্দ্যোপাধ্যায় তিনশ টাকা পণ নেবে। কারণ বিধবা গোলাপীর বিবাহের পরিবর্তে কৃপারাম আড়াইশ টাকা পণ নিয়েছিল।

বিধবা সুমতি মেয়েদের লেখাপড়া শেখাকে একেবারে মেনে নিতে পারেনি। অন্যদিকে সুমতির বোন বিধবা গোলাপী পড়াশুনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু অকালে বিধবা হওয়াকে গোলাপীর মা কমল মনে করেন বিদ্যাশিক্ষাই এই অকাল বৈধব্যের মূল কারণ। কমল বলেছে, —*''ছিরকাল জানি মেয়ে মানুষ লেখাপড়া শিক্‌লে বিদবা হয়ে থাকে, আমার গোলাপ ছেলেবেলা থেকে পুথী পাঁচালী পড়তে শিকেচে বলে কতই মনে মনে অসন্তুষ্টু হই, বলি পোড়া লেখাপড়া শেখার জন্যেই বুঝি তার অদেষ্ট এমন হলো।"*[৮৩] অর্থাৎ উনিশ শতকের সমাজের অন্দরমহলে বদ্ধমূল ধারণা যে, পড়াশুনাই বিধবা বিবাহের কারণ। আর তাই জগৎমোহিনীর বক্তব্য মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখে কি করবে। কোন দরকার ছাড়া লেখাপড়ায় মেয়ে মানুষের কোন কাজ নেই।

একাদশীর মতো কঠিন ব্রত পালনের মতো নিজ জীবনের প্রতি বিধবা গোলাপীর ঘৃণা

ধরে যায়। গোলাপী মনে মনে ভাবে,—''*(স্বগত) হায় কবে আমি কামিনীর মত গৃহের বাহির হইয়া মনোমত প্রাণবল্লভের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া সুখে কালযাপন করিব। কামিনী বাড়ীতে থাকিয়া যেমন কষ্টে দিন যামিনী অতিবাহন করেছিল, কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া সে তেমনি সুখ সন্তোষের মুখাবলোকন করিতেছে। হা বিধবা দশা! কবে তোরে আমি বিসর্জন দিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী? একাদশি, তুই যত পারিস্ অদ্য মাত্র কষ্ট দে যদি বিধাতা অনুকূল হন, তবে অচিরাৎ তোর হস্তে মুক্তে, মনের সাধে কালযাপন করিব।*''[৮৪]

গোলাপী মনে মনে স্থির করে নেয় যে, বিধবাদশার নির্মম পরিহাস থেকে মুক্ত হয়ে সে কামিনীর মত বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করবে। গোলাপীর কাছে সারাজীবন আড়ম্বরহীন, দুঃখ কষ্টের জীবনযাপন করবার চেয়ে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করা শ্রেয়। কিন্তু বিধবা সুমতির বৈধব্যজীবন নিয়ে নিয়মনিষ্ঠা পালনে কোন আক্ষেপ নেই। সে তার বোন গোলাপীর মতো ভাবতে পারে না। কিন্তু একাদশীর কঠিন ব্রতে তার জীবন ওষ্ঠাগত,—''*...কাল একাদশী গিয়েছে, তা যে তাত পড়েছে, কাল রেতে ভাবলেম্, বুঝি আর থাকতে পারিনে, এমনি জল তেষ্টা; পোড়া দশা বিদবা দশা, কত করে থাকলেম;...।*''[৮৫] সুমতির জলতেষ্টাও মেটে না একাদশীর নিয়মে। উনিশ শতকের বিধবা নারীদের একাদশী পালন এতটাই কঠিন যে, একাদশীর দিনে প্রাণবায়ু নিঃশেষ হয়ে গেলেও একফোঁটা জল খাওয়া যাবে না। নাট্যকার সুমতি ও গোলাপী— দুই বিধবার দুরকম মানসিকতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে বৈধব্য সংকটের এক করুণ চিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন।

১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয় *'সাক্ষাৎ-দর্পণ'* নাটক। *'সাক্ষাৎ-দর্পণ'* নাটকে বিধবা চরিত্র হিসাবে নাট্যকার তুলে এনেছেন, রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের কন্যা বামাসুন্দরীকে। এ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে বিধবা বামাসুন্দরীর বৈধব্য জীবনের পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার। বামাসুন্দরীর অপূর্ণ জীবনে বারে বারে মৃত স্বামীর স্মৃতি ঘুরে ফিরে এসেছে। বিধবা হবার পর, বাপের বাড়িতে চলে আসে বামাসুন্দরী। স্বামীর কথা মনে পড়লে যন্ত্রণায় তার বুক ফেটে যায়। মনের কথা বলবার বা শোনাবার কেউ নেই তার। উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে বিবাহের পর একজন নারীর কাছে স্বামীই সব। যখন সেই স্বামীকেই কোন নারীর অকালে হারাতে হয় তখন সেই নারীর জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। বামাসুন্দরীর স্বীকারোক্তিতেই উঠে আসে তাঁর বৈধব্য সংকট ও যন্ত্রণার ছবি,—''*আমাদের যে কত কষ্ট সে ভগবানই জানেন। আমাদের দুঃখু দেখেও কেউ দেখে না, গুনেও কেউ শোনে না। আগে আমাদের সকলে কত যত্ন করত, স্নেহ মমতা করত, এখন আমাদের দাসীর মত ব্যবহার করে।*''[৮৬]

বিধবা নারীর শ্বশুর বাড়িতে ঠাঁই হয় না। বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিতে হয় বাপের বাড়িতে। কিন্তু বাপের বাড়িতে আসবার পর জোটে অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা ও মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম। স্বামীর ছায়ায় বেঁচে থাকা রমণীর জীবন স্বর্গসুখে ভাসে। শ্বশুরবাড়ি অথবা বাপের বাড়িতেও সেই সধবা রমণীর কদর থাকে। কিন্তু বিধবা হবার পর আশ্রয়হীন হয়ে সেই রমণীর পুনরায় বাপের বাড়ির দ্বারস্থ হতে হয়। সেখানে জোটে অবহেলা, অবমাননা এবং লাঞ্ছনা। খাওয়া-দাওয়া, সাজ-পোষাক সবকিছু বর্জন করার পরেও বিধবা রমণীরা পায় লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান। বিধবা বামাসুন্দরী বিধবা নারীর দুর্দশাচিত্রকে নাট্যকার বর্ণনা করেছেন এইভাবে,—"*যার সোয়ামী নেই তার কে আছে বল দিকি? কোথায় গেলেই বা সে সুখ পায়? মা, বাপ, ভাই বোন কেউ কারো নয়। যার সোয়ামী নেই তার কেউ নেই। যদি কেউ একটা অপমানের কথা বলে, তাহলে অমনি মনে হয় আমার সোয়ামী নেই বোলে তাই আমাকে সকলে তাচ্ছল্লি করচে। কিন্তু সোয়ামী থাক্‌লে কেউ কত্তে পারত না।*"[৮৭] বৈধব্য জ্বালা, জৈবিক তাড়না অসহ্যকর। একাদশীর ফাঁদে অসহায় বিধবা নারীদের জীবন প্রতিমুহূর্তে ছট্‌ফট্ করে। আড়ম্বরহীন সাদা থানে যৌবনের জ্বালা লুকানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বিধবা রমণীদের কুলত্যাগী হতে হয়। ভ্রূণহত্যার মত মারাত্মক অপরাধে সামিল হতে হয় তাদের।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *'বিধবার দাঁতে মিশি'* নাটকে সৌদামিনী নামক এক বিধবাকে কেন্দ্র করে কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। প্রভূত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী বিধবা সৌদামিনীর কাছে অর্থই সংকটের মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লম্পট মদ্যপ গোরাচাঁদ বিধবা সৌদামিনীকে ছলে বলে করায়ত্ত করতে চেয়েছে। মাতাল চরিত্রহীন গোরাচাঁদের লোভী দৃষ্টিভঙ্গি অশ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করে,—"*এখন বাকী কেবল সৌদামিনী। আঃ—ছুঁড়ীর নাম কোল্লেই মুখ দে নাল পড়ে। ছুঁড়ীর কি রূপ! কি ভঙ্গিমা! কি নয়ন! কি বচন! আঃ লেডী মেরি আপ [উরুতে করাঘাত] কিন্তু, ছুঁড়ী বড় নাছোড়বান্দা। কতকগুলো ইংরিজি, বাঙ্গালা বৈ পড়ে, ছুঁড়ী বড় চালাক হয়েছে। এই কমাস ধোরে আমার বুদ্ধির হাড়ীকাটে ফেলবার জন্য এত চেষ্টা কচ্চি, ছুঁড়ী কিছুতেই ঘাড় নোয়াতে চায় না। এত পত্র লিখচি—এত সাধ্য সাধনা কচ্চি—কিছুতেই বশে আসচেনা। [মদ্যপান] ছুঁড়ী এমনি ছেনাল যে, কথাই কয় না। রূপের গৌরকেই হক—আর বিদ্যের গৌরকেই হোক—হিমালয়ের মত উঁচু হয়ে আছেই আছে। এক একবার ছুঁড়ীর ব্যাভার দেখে, রেগে মেগে উঠি, কিন্তু যাই তার মনোমোহিনী মূর্ত্তীটী হৃদয়ে উদয় হয়, আর অমনি জল—মদ আর মেয়েমানুষের কি মাহাত্ম্য!...ভীম যেমন দুঃশাসনের রক্তপান কোর্ত্তে প্রতীজ্ঞা কোরে, শেষে যে*

প্রতীজ্ঞা কোরে, শেষে যে প্রতীজ্ঞা সফল কোরেছিলেন, আমিও তেমনি প্রতীজ্ঞা কোচ্ছি যে, সৌদামিনীর যৌবনকমলের মধুপান কোর্ব্বই কোর্ব্ব।"[৮৮]

সুন্দরী ও উচ্চবংশজাত সৌদামিনী বাল্য জীবনে সুখী ছিল। বিবাহিত জীবনও ছিল সুখকর। কিন্তু সে সর্বগুণান্বিত পতিরত্ন পেয়েও হারিয়েছে। দীর্ঘদিন স্বামী না থাকার কারণে সমাজ তাকে বৈধব্য জীবনাচরণ করতে বাধ্য করেছে। তাই সৌদামিনী নিজেকে পাপী মনে করেছে। ক্ষণে ক্ষণে সৌদামিনী নিজের মৃত্যু কামনা করেছে। রুচিশীল ও শিক্ষিতা হবার সুবাদে আত্মহত্যার পথ সে বেছে নিতে পারেনি। প্রতিটি ক্ষণে দুঃখ তাকে হাতছানি দিয়েছে। গোরাচাঁদের নোংরা প্রস্তাব সৌদামিনীর কাছে কন্টকের মত বিঁধেছে। আত্মসম্ভ্রম বাঁচাতে সে গৃহত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করেছে। সৌদামিনী বাপের বাড়ী যাওয়ার সাহস পায়নি, লোকনিন্দার ভয়ে। ফলে সে কাশীতে মাতুলালয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লোলুপ গোরাচাঁদের অভব্য ব্যবহার সৌদামিনীকে সহ্য করতে হয়,—"*দেখি শালী! তোর মুখখানা কেমন দেখি।*"[৮৯] অদৃষ্টের কৃপায় সৌদামিনী রক্ষা পেয়েছে। হারানো স্বামীকে ফিরে পাওয়ায় তার বৈধব্য সংকট হতে মুক্তি ঘটেছে।

উনিশ শতকের সমকালে সম্পত্তি ও সম্ভোগের লোভে অনেকেই নিজ পত্নীকে অবহেলা করে বিধবা বিবাহে রাজী হয়েছিলেন। এই নাটকে সৌদামিনী তাঁর বৈধব্য জীবনের গ্লানি সম্পর্কে জানিয়েছে,—"*বিধির বিধানে আমি বিধবা—নবীন জীবনে বিধবা— পাপিনী— অভাগিনী। আমার এ পাপজীবন ধারণে কি প্রয়োজন? ধরাধামে আমার আর কি সুখ আছে? আমি অনাথিনী-বঙ্গ রমণী - বঙ্গ রমণীর এক পতির চরণ কমলই সম্বল, পতিই সুখদাতা - পতিই গতি- পতিই সর্বস্ব ধন। সেই হৃদয়-রাজ -জীবন-রাজ পতি বিহনে আমার আর জীবন ধারণে কি প্রয়োজন?-কি সুখ?*"[৯০] বস্তুত বৈধব্যকে নারীরা বিধির বিধান হিসাবে যেমন মেনে নিয়েছেন, তেমনি সংস্কার বশত 'এক পতির চরণই সম্বল' করে গ্লানিময় জীবনকে সহ্য করে গিয়েছেন।

সধবা রমণীর আদর, সামাজিক স্বীকৃতি সম্মান প্রাপ্য তৎকালীন উনিশ শতকীয় সমাজ ব্যবস্থায়। বিপরীতে, একজন বিধবা রমণী সমাজ দ্বারা অবহেলিত বঞ্চিত শ্বশুরবাড়ি থেকে পরিত্যক্ত। পরপুরুষ দ্বারা প্রলোভিত হওয়া বিধবা রমণীদের নিয়তি। জৈবিক চাহিদার কাছে হার মেনে বিধবা রমণীদের ভাগ্যে জুটতো ব্যভিচারিণীর তক্‌মা। তাদেরকে ভোগ করাই ছিল একশ্রেণীর পুরুষের উদ্দেশ্য। বেরঙিন জীবনে বিধবাদের উপরি পাওনা ছিল অপুষ্টি। আলোচালের ভাত ও একাদশীর মাহাত্ম্যে তাদের জীবনের পরিণতি কষ্টকর। অন্যদিকে সুযোগ পেলে সমাজ রক্ষক শিক্ষিত পুরুষেরাও বিধবা রমণীদের ব্যবহার করতে ছাড়েনি। বহুক্ষেত্রে, যুবতী বিধবাদের

যৌবনের তাড়না তাদের গর্ভবতী করে তুলেছে। যার ফলে ভ্রূণহত্যা অথবা বাড়ী ছেড়ে পালাবার মত অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হতে হয়েছে।

১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয় উপেন্দ্রনাথ দাসের '*শরৎ সরোজিনী*' নাটক। স্বদেশপ্রেমী সৎ আদর্শবান দয়ালু জমিদার শরৎকুমার দত্ত ও তাঁর বাড়িতে পালিত কন্যা সরোজিনীর কাহিনী অবলম্বনে *'শরৎ সরোজিনী'* নাটকটি রচিত। *'শরৎ-সরোজিনী'* নাটকের বিধবা চরিত্র ভুবনমোহিনী। মতিলালের বিধবা ভাতৃবধূ ভুবনমোহিনী সুন্দরী যৌবনবতী। ভুবনমোহিনীর স্বামী থাকাকালীন সময় থেকেই মতিলাল তাঁকে উত্যক্ত করতেন। কিন্তু কোনোভাবেই ভুবনমোহিনীকে বাগে আনতে পারেননি মতিলাল। যার ফলে, লম্পট মতিলাল তার লাঠিয়ালকে দিয়ে ভুবনমোহিনীর স্বামী তথা নিজের ভ্রাতাকে খুন করায়। মতিলাল তার মৃত ভ্রাতার সমস্ত সম্পত্তি জাল করে নিজের করে নেয়। বিধবা নিঃস্ব ভুবনমোহিনীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েও নিরূপায় ভুবনমোহিনী মতিলালের চক্রান্তে ধরা দিতে বাধ্য হয়, —*''কিছুদিন যায়, আমি একদিন একাদশী করে শুয়ে আছি, এমন সময়ে হঠাৎ আমার ঘরে গিয়ে উপস্তিত। আমার দাসী টাসীদের টাকা দিয়ে বশ করেছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও কারও সাড়া পেলেম না। একে আমি মেয়েমানুষ, তাতে সেদিন উপবাস করে শরীর কাহিল হয়ে পড়েছে, আমার—(ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া কম্পন)। গলায় দড়ী দিতে গেলেম, দিতে দিলে না—হাত পা বেঁধে রাখলে। মনে কল্লেম, না খেয়ে মরব—তাও হয়ে উঠল না, খাবার সময় চামচ জোর করে দুধ খাইয়ে দিতে লাগল। কিছু বল্লে, হেঁসে উড়িয়ে দিত। কেবল বলত "সুন্দরি, তোমাকে বড় ভালবাসি। এই রকম দিন পনর গেল। তখন "ভাবলেম, মিছে আর কেন নিজে মরবার চেষ্টা করি, ধর্ম্ম ত নষ্ট হয়েইছে। স্ত্রীলোকের সতীত্ব কাঁচের মত, একবার ভাঙ্গলে আর যোড়া দেওয়া যায় না।''*[৯১]

বিধবা ভুবনমোহিনীর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে জমিদার মতিলাল তাঁর বিকৃত কামনা বাসনা চরিতার্থ করেছে। কিন্তু সমাজে ভুবনমোহিনীকে অসতী রূপে পরিচিত হয়। অসতীর তকমা নিয়ে একটি অসহায় বিধবা নারীর বাকী জীবনটা কাটানো চরম বেদনাদায়ক। উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায়, বিধবা নারীদের জীবনের সংকট বহু। ভুবনমোহিনীর সংকটাপন্ন জীবনে স্বামীর প্রযোজনীয়তা প্রবল। কারণ একজন নারীর স্বামী বেঁচে থাকাকালীন সামাজিক লালসা তাকে সহজে গ্রাস করতে পারে না। বিধবা ভুবনমোহিনী জানিয়েছে,—*''স্বামী বেঁচে থাকতে স্ত্রীলোক প্রায় কুপথে যায় না, বিশেষ তিনি আমাকে বড় ভালবাসতেন।''*[৯২] কিন্তু বিধবাবস্থায়

একটি নারীর পক্ষে সতীত্ব রক্ষা করা কঠিন। একাদশীর মারণ নিয়ম, যৌবনজ্বালা, পুরুষ সঙ্গ, বাহ্যিক লোভ-লালসা একটি বিধবা নারীর সতীত্ব হরণে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে,—সে সংকট কথাই নাট্যকার বলতে চেয়েছেন।

সমাজের চোখে ভুবনমোহিনী অসতী। ভুবনমোহিনী তাঁর অবস্থান সম্পর্কে জানিয়েছে, —'' *আমি অসতী বলে আমাকে সকলেই ঘৃণা করে।*''[৯৩] মতিলালের লোলুপ দৃষ্টিতে ভুবনমোহিনী অসতী হয়। কিন্তু সমাজের চোখে মতিলাল নির্দোষ, ভুবনমোহিনী দোষী। বিনয়ের কথায় সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ে। বিনয় জানিয়েছে,—'' *লোকের কাছে মুখ দেখায় কেমন করে? মতিলালবাবু সম্পর্কে দেবর, তারই— । যাবকি?*''[৯৪] বিনয় ভুবনমোহিনীর কাছে যেতেও ঘৃণা বোধ করে। সমাজ ভুবনমোহিনীকে মতিলালের 'রক্ষিতা' বলে আখ্যা দিয়েছেন। শরৎকুমারের কথায়,—'' *আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলেম, "তুমি ঐ বেশ্যাটার কাছে রোজ রোজ যাও কেন?*''[৯৫] অসহায় বিধবা ভুবনমোহিনী লোকসমাজে বেশ্যায় পরিণত হয়। ফলে ভুবনমোহিনীর সঙ্গে যারা দেখা করতে যায় তারাও অসতী ও ভ্রষ্টা রূপেই আখ্যা পায়। বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি কোথাও তার ঠাঁই হয়নি। কিন্তু ভুবনমোহিনী নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। বিকৃতমনস্ক লম্পট মতিলালের মত মানুষেরা বিধবা নারীদের ভোগের সামগ্রী হিসাবে দেখে। বিধবা নারীদের হস্তগত করে, ফুসলিয়ে ভ্রষ্ট করার মধ্য দিয়ে আনন্দ লাভ করে। বিধবা ভুবনমোহিনী, মতিলালের সর্বনাশের পথ খোঁজে। ভুবনমোহিনী কিরীচ দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়। শেষে নিজেও কিরীচ দিয়ে নিজ বুকে আঘাত করে মৃতুশয্যায় শায়িত হয়।

সমাজ প্রতিকূলতা বিধবা নারীকে বিপথে-কুপথে চালিত করে। কেউ বা স্বেচ্ছায় পদস্খলিত হয়, আবার কেউ বা পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয় কুপথে পা বাড়ায়। কারুর কাছে একাদশীর ব্রতপালন মৃত্যু স্বরূপ। কেউ যৌবন তাড়নায়, ভ্রূণহত্যার মত পাপকাজে নিজেকে নিয়োজিত করে। বেশ্যাবৃত্তিকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে কেউ বা দৈহিক চাহিদার নিরসন ঘটায়। আবার কেউ বা পরিস্থিতির চাপে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে নিজের কাছে নিজে ক্রমাগত ছোট হয়ে যায়। বস্তুত উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় বিধবা রমণীদের পরিণতি ভয়াবহ। ভুবনমোহিনীর মত বহু নারীর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে লোভী মানুষেরা নিজ যৌনতৃষ্ণা নিবৃত্ত করলেও সমাজ সেই অসহায় বিধবা নারীকে ত্যাজ্য করে, কুলটা আখ্যা দেয়। নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁর *'শরৎ সরোজিনী'* নাটকে ভুবনমোহিনী চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিধবা নারীর সংকটকে তুলে ধরেছেন।

১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয় জনৈক ভদ্রমহিলা প্রণীত *'সন্তাপিনী নাটক'*। *'সন্তাপিনী নাটক'* বিধবা বিবাহের পক্ষে রচিত। পুনর্বিবাহিতা নারীর সামাজিক স্বীকৃতি এবং তাঁদের সন্তান ধারণের ছবিকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন নাট্যকার। এ নাটকের মূল কাহিনী আবর্তিত হয়েছে জমিদার পুত্র নবকুমার ও সিন্ধুবালার (সন্তাপিনী) বিবাহ, বিচ্ছেদ ও সিন্ধুবালা কর্তৃক নবকুমারের নৈতিক উপদেশ প্রদান প্রভৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে। এ নাটকের দ্বিতীয় আখ্যানে বর্ণিত হয়েছে বাল বিধবা কমলিনীর বিধবা বিবাহ উত্তর জীবনের সংকট চিত্র। এই অংশে দেখা যায় বিশ্বেশ্বর তাঁর প্রথমা পত্নী বিরাজমোহিনীর অত্যাচার হতে মুক্ত হবার জন্য পাটনা হতে পত্নীর আত্মীয়ার এক বালবিধবা কমলিনীকে বিয়ে করে ঘরে আনেন (নাটক রচয়িতার মতে আঁতুড় ঘরের বিধবা)। ধনী পিতার কন্যা কমলিনী শৈশবে বিধবা হলেও বাল্যকাল হতে বাবা-মায়ের যত্নে লালিত পালিত হয়েছে। একাদশীর নির্মমতা কিংবা অর্থকষ্টের নিদারুণ দারিদ্রে তাঁর জীবন পীড়িত হয়নি। বিধবা কমলিনী শিক্ষিতা। কমলিনীর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্বেশ্বরকে আকর্ষণ করেছে। বিশ্বেশ্বর কমলিনীর বিয়ে হিন্দু বা ব্রাহ্ম কোন মতেই হয়নি। তাদের বিয়ে হয়েছে গান্ধর্ব মতে। পাটনা থেকে বিধবা কমলিনীকে বিবাহ করে এনে তাকে পাটরাণী করে তুলেছেন বিশ্বেশ্বর। কমলিনী স্বামীর প্রিয়। রূপে গুণে, বিদ্যায় সতীত্বে, পবিত্রতায়, ভক্তিতে সে সকলের মন জয় করে নিয়েছে। নাট্যকার বিধবা বিবাহের সুফল দেখিয়েছেন, কমলিনী ও বিশ্বেশ্বরের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। গান্ধর্ব মতে বিবাহিতা বিধবা কমলিনী দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসে গর্ভধারণ করেছে। বিধবা বিবাহ করার কারণে বিশ্বেশ্বরকে সমাজের কাছে বন্ধু-বান্ধবের কাছে নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে। পুনর্ভু কমলিনী স্বামীর গরবে গরবিনী হয়েছেন। যদিও কমলিনীকে শুনতে হয়েছে নানান কটুকথা,—*'পতিহীনা নারী দ্বিচারিণী'*। মেয়েমহলে শুনতে হয়েছে নানান কানাকানি। বিশ্বেশ্বরের প্রথম পত্নী বারবার চক্রান্ত করেছে বিশ্বেশ্বরের সতীন কমলিনীর বিরুদ্ধে। কারণ স্বামীর সব স্নেহ ভালোবাসা দ্বিতীয় স্ত্রীর পতি। এ সহ্য হয়নি প্রথম পত্নী বিরাজমোহিনীর। সে বারবার চক্রান্ত করেছে কমলিনীকে স্বামীর কাছে চক্ষুশূল করে তুলতে। বিরাজমোহিনী প্রবল আক্ষেপে জানিয়েছে,—*''কি করব ভাতার বেশ্যা রেখেছে তার পায় না ধল্যে জন্মই বৃথা।''*[৯৬]

এরপর দেখা যায়, বিশ্বেশ্বরের প্রথম স্ত্রীর প্ররোচনায় কমলিনী গৃহত্যাগ করেছে। কমলিনী গৃহত্যাগ করলে অন্তঃপুরে মেয়েমহলে বলতে শোনা গেছে,—*''...একজনের সঙ্গে নষ্ট হয়েছে, তা আর একজনের সঙ্গে হতে পারে না?...ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা তার আবার এত সুখ কেন?... রাঁড় মানুষ আর ময়লা ফ্যালা গাড়ী সমান...।''*[৯৭] প্রথম স্ত্রীর প্ররোচনায় বিশ্বেশ্বর দ্বিতীয় স্ত্রীকে

সন্দেহ করেছেন এবং 'কুলটা' বলতে দ্বিধা করেননি। বিশ্বেশ্বর জানিয়েছে,—''*(স্বগতঃ) উঃ মনের ভিতর যেন পুড়ে যাচ্চে, মায়াবিনী দ্বিচারিনী কপট প্রণয় কেমন করে শিখেছিল, কি ভয়ঙ্করী নারী! (প্রকাশ্যে) 'নববাবু, পাপিয়সী কুলকলঙ্কিনী কালামুখীর জন্যে লোকালয় ছেড়ে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা কচ্চে।'*''[৯৮] সমকালে বিধবা বিবাহের পর পরিবারে নানা সংকট উপস্থিত হত—সেই করুণ ছবিই নাট্যকার তুলে ধরেছেন এই অংশে।

পুরুষমহলে তৈরি হয়েছে নানা কৌতূহল। প্রলোভনের জাল বিস্তার হয়েছে বহুধায়। মেয়ে মহলে বলতে শোনা গেছে, 'মিটমিটে ডান', 'ছেলে খাবার রাক্ষস' প্রভৃতি অপবাদ। মণিমোহনের স্ত্রী জয়াবতীকে বলেছেন,—''*...একটা আঁতুড়ে রাঁড়ীকে স্ত্রী বলে পরিচয় দেওয়া, সেটা কি ভাল? সে যে লেখাপড়া জানে, পুরুষের চোদ্দপুরুষ,...লজ্জা ঘৃণা কি, ভয়ই বাকি!*''[৯৯] উনিশ শতকে সমাজ অন্তঃপুরে চালু ছিল মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা দিলে, সে মেয়ে অকালে বিধবা হয়, কুলটা হয়, কুপথে বাড়ায়। সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে এই অংশে। সামাজিক অসাম্য পুরুষের তৈরি। পুরুষ নিষ্ঠুর খল চতুর। পুরুষ জাতির প্রতি বিদ্রূপ বিদ্বেষ জানিয়ে সিন্ধুবালা (সন্তাপিনী) জানিয়েছে,—

"যদি কুলনারী হয় লজ্জাবতী।
অমনি পুরুষ বলে জানি, বড় সতী।।
যদি নারী মুখ তুলে কথা নাহি কয়।
বলে, অহঙ্কারী নারী জেনেছি নিশ্চয়।।
যদি ভাল কথা কয় না জানে মঞ্জাল।
বলে বেশ্যা ও কামিনী, বড়ই বাচাল।।''[১০০]

সিন্ধুবালার মধ্যস্থতায় বিশ্বেশ্বর নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং কমলিনীকে সাদরে গ্রহণ করেন।

এই নাটকের কাহিনীতে দুজন পুরুষ চরিত্র প্রাধান্য লক্ষ করা যায়—নবকুমার ও বিশ্বেশ্বর। দুজনেই প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। নবকুমার পিতার ক্রোধের কথা ভেবে সিন্ধুবালাকে ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রের জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। হিন্দু সমাজে নারীর পতি বিনা গতি নেই তাই সিন্ধুবালা ফিরে এসেছে পুনরায় স্বামীর কাছে। স্বামীই তার আরাধ্য। স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ তার কাছে 'বিবাহ অসহ্য'। তাই সে আবার ঘর ছেড়েছে। অন্যদিকে বিশ্বেশ্বরের প্রথম স্ত্রী তার ভাগ্যকে মেনে নিতে পারেনি। একটি বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে স্বামীর ঘরে আনাকে সে মেনে নিতে পারেনি। সতীন নিয়ে ঘর করতে সে রাজী হয়নি। তাই সে মনস্তাত্ত্বিক

ভাবে হিংস্র হয়ে উঠেছে। সিন্ধুবালা দ্বিতীয় অঙ্কে জানিয়েছে,—

"বিবাহ বিষের বাতি নারীর কারণ।

পুরুষের নিকটেতে অধিক যতন।"[১০১]

স্বামীহীনা নারী পরিবারে সমাজে অযত্নই পেয়ে থাকে। স্বামী থাকলেই নারীর যত্ন ও সুখ বিরাজমান থাকে। বস্তুত এ নাটকে বিধবা কমলিনীর সংকট ও দুর্দশার কারণ হিসাবে তাঁর স্বামীর চরিত্রের দৃঢ়তার অভাবকে দায়ী করেছেন নাট্যকার।

১৮৭৭ সালের জুলাই মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *'এমন কর্ম আর করব না'* নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯১০ সালে এ নাটক নাম বদলে *'অলীকবাবু'* নামে প্রকাশিত হয়। এ নাটকের আলোচনায় আমরা দেখেছি মিথ্যুক ভণ্ড অলীকবাবু অভিজাত ঘরের কন্যা হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করার জন্য মিথ্যার জাল বয়ন করে এবং বিবাহের যোগাযোগের জন্য এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মোসাহেব গদাধরকে কাজে লাগায়। অন্যদিকে অলীকবাবুর যাতে বিবাহ হয় তার জন্য সাহায্য করেছে হেমাঙ্গিনীর দাসী প্রসন্ন। প্রসন্ন বিধবা। দাসী প্রসন্নকে গদাধর বিবাহ করতে চায়। কারণ ধূর্ত গদাধরের বিধবা বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হল, প্রসন্নের টাকা ও বিধবা বিবাহের জন্য প্রদত্ত অর্থ হস্তগত করা।

'অলীকবাবু' নাটকে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ এসেছে হেমাঙ্গিনীর বিধবা দাসী প্রসন্নের অনুষঙ্গে। জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের মোসাহেব গদাধর প্রসন্নকে ভালোবাসার কথা বলে, তাকে বিবাহের কথা বলে। প্রসন্ন গদাধরের সঙ্গে প্রেমের রসিকতায় নিজেকে আড়াল করে। বিধবা প্রসন্ন পুনর্বার বিবাহ করবার কথা ভাবতেই পারে না। অশিক্ষিত বিধবা রমণীদের 'বিধবা বিবাহ' অকল্পনীয়। প্রসন্ন জানে বিধবা হওয়ার পর, অবৈধ প্রণয় করা গেলেও পুনর্বার বিবাহ করা পাপ। পুনর্বিবাহ লজ্জাদায়ক, ঘৃণ্য অপরাধ। কিন্তু গদাধর ও হেমাঙ্গিনীর মুখে সে 'বিধবাবিবাহে'র আইনের কথা শুনে উৎফুল্ল হয়। দ্বিতীয়বার এয়োস্ত্রী হয়ে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করে প্রসন্ন। বিধবা বিবাহের আনন্দে উল্লসিত হয়ে প্রসন্ন চমৎকৃত হয়ে বলেছে, —*"যে পণ্ডিত এ কথা বলেছে তার মুখে ফুল চন্নন পড়ুক।"*[১০২] গদধরের সঙ্গে পুনর্বিবাহের কথা ভেবে প্রসন্ন নবজীবনের স্বপ্ন দেখে।

ধূর্ত ও ঠগ গদাধর প্রসন্নকে ভালোবাসে না। বিধবা প্রসন্নকে বিবাহ করলে গদাধর পাঁচ হাজার টাকা বকশিস পাবে এবং প্রসন্নের গয়না ও অর্থ হস্তগত করতে পারবে। এই উদ্দ্যেশ্যে গদাধর প্রসন্নকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। প্রসন্ন স্বগত সংলাপে জানায়,— *(স্বগত) ভাল একটা*

কথা মনে পড়ল। আমাদের জগদীশ বাবু আমাকে বলেছিলেন যে যদি আমি বিধবা বে কত্তে পারি, তা হলে তিনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। তিনি বলেন যে বিধবা বে চলতি না হলে দেশের ভাল হবে না। আর এই জন্য তিনি বিস্তর টাকা খরচ কচ্চেন। এতে দেশের ভালই হোক আর মন্দই হোক্, তাতে আমার কিছু এসে যায় না—আমার কিছু লাভ হলেই হল।...মাগিকে যদি রাজি কত্তে পারি, তাহলে ওর হাজার টাকাটা গাঁড়া দেওয়া যাবে, আবার আমাদের বাবুর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা হাতানো যাবে।''[১০৩] ফলে নিজের বিয়ের আশায় ধূর্ত গদাধরের সঙ্গে ফন্দি করে। মিথ্যেবাদী অলীকবাবুর ভণ্ড কাজকর্মে সাহায্য করেছে।

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে বিধবা বিবাহ আন্দোলন অনেকটা স্থিমিত হয়ে এসেছিল। সেই সময়কালে বিধবা বিবাহকে অবলম্বন করে এক ধরনের তঞ্চকতা সমাজে চালু হয়েছিল। বিধবা রমণীকে ফুসলিয়ে কিংবা বিধবা বিবাহের নামে পয়সা রোজগারের নতুন পন্থা হিসাবে বিধবা বিবাহ সমাজ সংস্কারে নেমে পড়েছিলেন একধরনের প্রবঞ্চক, ঠক শ্রেণীর মানুষ। ১৮৭৭ সময়কালে, এই শ্রেণীর বিধবার পাণিগ্রহণকারী ঠক প্রবঞ্চক ধূর্ত মানুষকে অনাবৃত করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর গদাধর চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সেকালে গদাধরের মত বহু প্রবঞ্চক বিধবা রমণীদের বিবাহ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন শুধু অর্থের লোভে। সমাজের ভালোমন্দ কিংবা বিধবা রমণীটির পুনর্বার বিবাহের যে আনন্দ, সেই বিষয়ে গদাধরের মত মানুষেরা চিন্তাশীল থাকেনি। আখের গোছানোই এদের কাজ। পুনর্বিবাহ পরবর্তী জীবনে রমণীটির জীবনযাত্রার সঙ্গী হয়ে কাটানো এদের উদ্দেশ্য নয়। ফলে বহু রমণীর পুনর্বিবাহের পর অসহায় ও অনাথ হয়ে অন্য বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রসন্নের এই সংকটের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে তৎকালীন সমাজের কুটিল মানসিকতা সম্পন্ন মানুষের অবয়ব চিত্র।

১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয় বিরজামোহন চৌধুরীর *'বঙ্গবিধবা'* (১৮৮২) নাটক। *'বঙ্গবিধবা'* রূপক নাটক। নাট্যকার বিরজামোজন চৌধুরী রূপকের মধ্য দিয়ে বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। অধর্ম, শঠতা, স্বার্থপরতা, রতিকাম, বিধাতা ও বিধবা এই কল্পিত চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নাট্যকার বিধবার সংকট যন্ত্রণাকে উপস্থাপিত করেছেন।

বঙ্গবিধবা ঈশ্বরের কাছে আক্ষেপের সুরে কৈফিয়ৎ চেয়েছেন। সে কৈফিয়তের সুরে ধরা পড়েছে বিধবা নারীর মনোকষ্টের নিদারুণ ছবি,—

''বিধবা ।। আবার আমার যে জ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্বলিত হচ্ছে। জ্ঞান। তুমি বঙ্গের বিধবা যেন চিরদিনই উন্মাদিনী থাক।

বিধাতা।। কেন তুমি ভারতে নারীজাতির সৃষ্টি করেছ? যদি সৃষ্টিই করলে তবে কেন পুরুষের ন্যায় কঠিন হৃদয় করলে না। তোমার দোষ নাই, আমাদের কর্ম দোষ। যত মহাপাপীদিগকে ভারতে নারীজাতি করেছ, আমাদের উপযুক্ত শাস্তি দিচ্চ নরকাগ্নিতে দগ্ধ কচ্ছ। স্বার্থপরতা। এ বঙ্গে এ ভারতে তুমিই আজ রাজা। সকলই তোমার দাস হয়ে রয়েছে। ধন্য তোমায়। ধন্য তোমার ক্ষমতার, তোমার মহিমায় কেহ পরের দুঃখ দেখতে পায় না, অনুভব কর্তে পারে না, বুঝতেও পারে না।'' [১০৫] এ নাটকে বৈধব্যের যন্ত্রণা ছাড়া অন্য কোন সংকটের ছবিকে নাট্যকার তুলে ধরেননি। রূপকের মধ্য দিয়ে বিধবা নারীর মনোকষ্টকে রূপ দিয়েছেন মাত্র। বিধবা নারীরা তাদের কর্মদোষকে বড় করে দেখেছেন আর বিধাতার কাছে আক্ষেপ করেছেন। *'বঙ্গবিধবা'* নাটকের বিষয় বক্তব্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের যুক্তি শৃঙ্খলা ও বিধবাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৮৭ সালের ১৯শে নভেম্বর 'এমারেল্ড থিয়েটারে' *অজ্ঞাতনামা রচিত 'বিধবা সঙ্কট'* নাটকটি অভিনয়ের পর ১৮৯০ সালে গ্রন্থাকারে এ নাটক প্রকাশিত হয়। এ নাটকের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে সুশীলা নামক এক বিধবার কাহিনী দিয়ে। সুশীলা ষোল বছর বয়সে বিধবা হয়। সুশীলার স্বামী বিয়োগ ঘটলেও সে পতিব্রতা। সে তার স্বামীকে ভালোবাসে, স্বামীর সুখস্মৃতি অবলম্বন করে বাঁচতে চায় বাকি জীবন। সুশীলার দেওর রামচন্দ্র। বৌ সৌদামিনী। রামচন্দ্র বৌদি সুশীলাকে পুনর্বার বিবাহ করার জন্য অনুরোধ করেছে। কিন্তু সুশীলা অনড়। রামচন্দ্র ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে বিধু নামে এক রক্ষিতা রেখেছে।

রামচন্দ্রের স্ত্রী সৌদামিনীর সঙ্গে, সৌদামিনী ও সুশীলার সঙ্গে সম্পর্ক বোনের ন্যায় সম্পর্ক। কিন্তু বিধবা ভাজ সুশীলার পুনর্বিবাহকে সমর্থন করে না সুশীলা। সুশীলার বোন ও চারুমতীর ননদ সরলাও চোদ্দ বছরের বিধবা। সরলা বৈধব্যকে মেনে নিয়ে ধর্মেকর্মে মনোনিবেশ করেছে। সরলার ধারণা এ জন্মে ভালো ধর্মাচরণ করলে পরজন্মে ভালো হবে। পূর্বজন্মে পাপ করেছিল বলেই সরলা এজন্মে বিধবা হয়েছে।

অন্যদিকে গুরুদেব কালীকিঙ্করের বিধবা বৌমা শিক্ষিতা চারুমতীর ধর্মপুস্তকে আগ্রহ নেই। আর তাই বৌমা চারুমতীকে নিয়ে কালীকিঙ্করের আক্ষেপের শেষ নেই। চারুমতী বিপথগামী হয়েছে তা জানতে পেরে কালীকিঙ্কর বিধবা নারীর দুঃখজনক জীবনের করুণ দিকটি অনুভব করেছেন। আক্ষেপ করে জানিয়েছে,—''*ঠাকুর! বলতে পারেন, কোন পাপের ফলে কন্যা বিধবা হয়? বিবাহিত পুত্র, পত্নী রাখিয়া অসময়ে মারা যায়? আর কোন পুণ্য ফলেই বা*

পুনর্জন্মে আর এ বিধবা সঙ্কট না ঘটে?"[১০৬] কালীকিঙ্কর তার বৌমা চারুমতীর মুখ দর্শন করতে চায় না। চারুমতী অনুতপ্ত হয়। সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। সে তার দুই ননদ সরলা ও সুশীলার সঙ্গে হরিদ্বারে চলে যেতে চায়।

নাট্যকার খুব সহজেই সমাজের বাস্তব দিকটি আলোচ্য নাটকটির মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। বস্তুত *'বিধবা সঙ্কট'* নাটকটিতে নাট্যকার বিধবা চরিত্রের বিবাহ দিতে সক্ষম হননি। 'বিধবাবিবাহ' আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া ততটা সহজ ছিল না। স্বয়ং বিধবা রমণীগণ এতে রাজী ছিল না। আবার কিছু সংখক বিধবা রমণীদের ইচ্ছে থাকলেও উপায় হয়নি। ফলে শিক্ষিতা চারুমতীও গণ্ডীর বাইরে যেতে পারেনি। বিধবা হয়ে কষ্টকর জীবনযাত্রা মেনে নিতে পারেনি। নতুন স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সমাজের রক্তচক্ষুর সামনে তাকে শিথিল হতে হয়েছে। চারুমতী শেষ পর্যন্ত নিজেকে অসতী বলেছে, পাপিষ্ঠা বলেছে। চারুমতী ভগবানের পায়ে সমস্ত কিছু নিবেদন করতে বাধ্য হয়েছে। নিজের দুই বাল্য বিধবা ননদ সরলা ও সুশীলার মত জীবন সে বেছে নিয়েছে। চারুমতী ব্যভিচারিণী নয়। শুধুমাত্র মনের ইচ্ছার সম্মান করতে চেয়েছিল সে। শিক্ষার মান রক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। সমাজের অন্যান্য নিয়ম কানুনের বেড়াজালে সে আটকে যায়।

নাট্যকার *'বিধবাসঙ্কট'* নাটকটিতে বিধবাদের নানান সঙ্কটের কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিধবাদের শিক্ষাদানের বিষয়ে তিনি উৎসাহী। কিন্তু সেই শিক্ষা যাতে বিপথগামী না হয়, সেইদিকেই মূলত দৃষ্টিপাত করতে চেয়েছেন নাট্যকার। কালীকিঙ্করের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তুলে ধরেছেন সামাজিক সমস্যাটিকে,—"*প্রভু! আপনি আমার হয়ে বঙ্গবাসীকে বলবেন, যেন তাঁরা এ সঙ্কটকে আর উপেক্ষা না করেন। আমার ন্যায় অনেকেই এইরূপ বা অন্যরূপ বিধবা সঙ্কটে পড়েছেন, অনেকেই হয় তো এখনও পতিত, অনেকেরই ভবিষ্যতে পড়বার সম্ভাবনা। কিন্তু সাবধান! স্ত্রীলোকের সুশিক্ষা হয়, সে মন্দ নয়, কিন্তু কুশিক্ষার বড় বিষ ফল ফলে। বিশেষ বিধর্ম্মীর হাতে যেন যুবতী বিধবাদের শিক্ষার ভার দিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত না থাকেন।*"[১০৭]

কালীকিঙ্করের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সামাজিক সমস্যাটিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। যুবতী বিধবাদের বিধর্মী হওয়াটাও এক শ্রেণীর মানুষ উপভোগ করত। যুবতী বিধবাদের বিপথগামী করে তাদের ভোগ করাই ছিল এই শ্রেণীর মানুষের উদ্দেশ্য। যারা বিধবাদের বিবাহ দেবার নাম করে ভোগ করার পরিকল্পনা করত। যারা সমাজে ধর্মধারীর মুখোশ পরে বাড়ীতে নানান কুকাজে লিপ্ত থাকত। নাট্যকার বিধবা 'নারীদের সঙ্কট' তুলে ধরতে গিয়ে সমাজের

মুখোশধারী মানুষদের তুলে ধরেছেন। যারা শুধুমাত্র লোভ লালসায় লিপ্ত থাকে। মঙ্গল সাধনায় নয়। অজ্ঞাতনামা নাট্যকার *'বিধবা-সঙ্কট'* নাটকের মধ্য দিয়ে বিধবাদের সঙ্কটকে অসামান্য ভাবে তুলে ধরেছেন।

১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয় রসরাজ অমৃতলাল বসু প্রণীত *'তরুবালা'* নাটক। *'তরুবালা'* নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, অখিলচন্দ্র ও বিধবা তরুবালার দাম্পত্য প্রণয় সংকট। এ নাটকে বিধবা তরুবালা-অখিলচন্দ্রের মূল কাহিনীর সমান্তরালে দুটি উপকাহিনী স্থাপন করেছেন নাট্যকার। বেণী ও শান্তর উপকাহিনী এবং মৃত্যুঞ্জয়-আমোদিনীর কাহিনী। বেণী ও শান্তর উপকাহিনীতে 'বিধবা বিবাহে'র বিরুদ্ধে নাট্যকার সওয়াল করেছেন।

'তরুবালা' নাটকটিতে নাট্যকার তরুবালা নামক এক সতীসাধ্বি স্বামীসোহাগ বঞ্চিতা নারীর কাহিনী। আলোচ্য নাটকে তরুবালার একনিষ্ঠ প্রেম ও স্বামীপরায়ণা মনোভাবের মধ্য দিয়ে নিজ স্বামী সোহাগের অধিকারিণী হয়ে ওঠার কাহিনী বর্ণিত করেছেন নাট্যকার। 'বিধবা বিবাহে'র আন্দোলনে সমাজ ভয় বড় ভূমিকা নিয়েছিল। সমাজ ভয়কে উপেক্ষা করে অনেক পুরুষ 'বিধবা বিবাহে' এগিয়ে এলেও বিধবা নারীরা সেভাবে সাড়া দেয়নি। নাট্যকার সেই বাস্তব সত্যকে *'তরুবালা'* নাটকে উপস্থাপিত করেছেন 'শান্ত-বেণী'র উপকাহিনীর মধ্য দিয়ে।

তরুবালার ননদ 'শান্ত' একজন বিধবা নারী। বিধবা শান্ত তার শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তিসহ বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছে। বিধবা শান্তকে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ভূ-সম-পত্তি থেকে বঞ্চিত করেননি। নাট্যকার শান্ত চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের অন্য একটি মানবিক দিকের ছবি তুলে ধরেছেন। নাট্যকার অমৃতলাল বসু শান্তর বৈধব্য জীবনকে ভক্তিমার্গে দৃঢ় করেছেন। বিধবা বিবাহে শান্তকে অগ্রসর হতে দেননি। নাটকটিতে একাধারে যেমন, স্বামী সোহাগ বঞ্চিতা একজন নারীর কাহিনী তেমনি অন্যদিকে একটি বিধবা নারীর সমগ্র জীবনের পরিণতির কথা ধরা পড়েছে।

শান্ত বিধবা। বিধবা শান্তর মন ভক্তি ভাবুকতায় নিমজ্জিত থাকে। বিধবা শান্তকে হাতিয়ার করে সে অখিলের সম্পদ দখল করতে চায়। বেণী জানিয়েছে,—'' *...আর অখ্‌লের মজা দেখ, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাচ্ছে; বাপের বিষয় তো ভোগ করছিলই, জলেই জল বাধে, কোত্থেকে দেখনা বোনটা বিধবা হয়ে শ্বশুর বাড়ীর বিষয় বার করে নিয়ে বাড়ীতে এসে ঢুকলো মজা করে এখন তাও ভোগ করছে। শান্তকে কোন রকম করে হাত করতে পারি, কুভাবের কথা ওর সঙ্গে চলবে না, বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে আবার বে করতে রাজী করাতে পারি, তা হলে*

বিষয়টাও হাতে আসে, স্ত্রীর মতন স্ত্রীও হয়!"[১০৮] এই অংশে নাট্যকার,—বিধবা হওয়ার পর স্বামীর সম্পত্তি অধিকারের প্রসঙ্গ যেমন উত্থাপন করেছেন তেমনি, অর্থলোভে বিধবার সম্পত্তি ভোগের অভিসন্ধিতে সেকালে অনেকে বিধবা বিবাহে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, সে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। নাট্যকার বিধবা বিবাহের নামে একশ্রেণীর মানুষের অর্থলোভী ঘৃণ্য মানসিকতাকে প্রকাশ করেছেন।

ভগবান সহ্য করার জন্য নারীদের বিধবা করেন। বিধবাদের অনাড়ম্বর জীবনে ঠাকুর দেবতার আশ্রয়ই একমাত্র সম্বল। তাই বিধবাদের ভগবান মুখ বুঝে সহ্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন বলে এমনটাই তৎকালীন সমাজের ধারণা। তরুবালা, শান্ত ও আমোদিনীর কথা প্রসঙ্গে বিধবা শান্তর স্বামীর প্রসঙ্গে নিষ্ঠা ও ভক্তি চোখে পড়বার মত,—"*না না বৌ কনেদিদি ভাল কথাই বলছে, একটু সাধলে অপমান সইলে যদি সোয়ামী আপনার হয় তা কি ছাড়তে আছে? আমার দুখানা হাত কেটে দিলেও যদি সে ফিরে আসে, ফিরে এসে যদি চিরজীবন আমায় পায়ে দল্‌তে থাকে তা হলেও আমি মনে করি যে আমার মত ভাগ্যবতী আর কেউ নাই!*"[১০৯] উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় শান্তর মত বহু রমণীর স্বামী বিয়োগের আক্ষেপ তাদের প্রতিটি ইচ্ছার সমাধি স্থাপন করে। স্বামী বেঁচে না থাকায় শান্ত জীবনের প্রয়োজনীয়তাটুকু প্রায় হারিয়েছে। স্বামী খারাপ হোক, অন্যায় আচরণ করুক, চিরকাল দাসী বানিয়ে রাখুক—তাতেও যেন নারীর আনন্দ। কিন্তু স্বামী বিয়োগের ফল—বৈধব্য জীবনের করুণ পরিণতি যা শান্তর কথায় স্পষ্ট।

শান্ত মনে মনে দেবতাজ্ঞানে স্বামীকেই পূজা করেছে। তাই স্বামী বিয়োগের পর নিজ প্রাণ দেবতার চরণে সমর্পণ করেছে। নিজ বয়ঃসন্ধিকালে ধর্মে মনঃসংযোগ করেছে। শান্তর কথায় বিধবা বিবাহ হলেও পরকালে স্বামীর আশ্রয় কোন্‌টি হবে তা সে জানে না। তাই বিধবাদের বিবাহ না হওয়াই শান্তর মতো মেয়েদের মনোভাব। শুধু শান্ত নয়, উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় শান্তর মত বহু নারীই মনে করে বিধবা বিবাহ হলে পরকালে শান্তিপ্রাপ্তি হয় না। বিধবাদের পুনর্বিবাহ মহাপাপ। বিবাহ একবারই হয়। যদি সেই স্বামী বেঁচে থাকে সেই নারী ভাগ্যবতী। যদি স্বামী প্রয়াণ ঘটে তবে তা অদৃষ্ট। যার ফলে যৌবন সহ বাকী জীবনের ঠাঁই হয় ঠাকুর দেবতার কর্মে চরণে-সেবায়। শান্ত কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পড়ে। বিধবা হওয়ার পর বাপের বাড়ী চলে আসার পরও শান্ত শুধুমাত্র স্বামী নয় শ্বশুর বাড়ীর সমস্ত নিয়ম মেনে চলে। শান্ত বিধবা বিবাহকে সমর্থন করতে পারে না। সে মনে করে বিধবাদের পুনরায় বিয়ে হলে তারা শুধু অমঙ্গল করতে পারে, সংসারের ক্ষতি করতে পারে।

শান্তর ধারণা ভদ্র ঘরে বিধবারা পুনরায় বিবাহ করে না, নীচু জাতের মধ্যে বিধবা বিবাহ চালু আছে। বেণী শান্তর দুঃখের কথা জানতে চায়। উত্তরে শান্তর নিজস্ব যুক্তি রয়েছে। শান্তর ধারণা তার স্বামী মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে গিয়ে দেবতা হয়েছেন। আর শান্ত মারা গেলেই স্বর্গে তাদের দেখা হবে। সেখানে তারা অমর আর তার বিধবা হওয়ার ভয় থাকবে না,—"*কি দুঃখের কথা বলছো? ভাল কাপড় পরতে পাইনে গহনা পরতে পাইনে? সাজাগোজা তো স্বামীর চক্ষে ভাল দেখবার জন্য, একাদশী করা? হিঁদুর মেয়ে, পাঁচ বৎসর বয়স থেকে ব্রত করতে শিখেছি, একটু একটু করে উপোষ অভ্যাস হয়েছে;...মলেই তো আবার সেই স্বামীকে পা'ব তখন তো আর বিধবা হবার ভয় থাকবে না। আমার সোয়ামী স্বর্গে গিয়েছেন দেবতা হয়েছেন; এখন যে আমি দেবতার স্ত্রী!*"[১১০]

পরকালীন সুখের আশায় পৃথিবীর সকল সুখ ভোগ ত্যাগ করে শান্তর মত বিধবা রমণীরা মন অবিচলিত রাখতে তারা ছুটে গেছে ঠাকুরঘরে। পাছে তাদের মন বিচলিত হয়, পাপী হয় এই ভয়ে। শান্তর কথায়,—"*মন আমি এক রকম ঠিক করেছি, এসব কথা তোলাপাড়া করলে আবার শরীরে ভাবনা আসতে পারে মনও খারাপ হতে পারে, আমায় আর ওসব কথা কিছু বলোনা। যাই ঠাকুর ঘরে যাই আবার পূজোর উদ্যোগ করতে হবে।*"[১১১]

বিবাহিত বেণী দাম্পত্য জীবনে সুখী নয়। তাই সে আবার বিধবা শান্তকে বিবাহ করতে আগ্রহী। কিন্তু শান্তকে বিবাহ করে সে তার সম্পত্তি হস্তগত করার বাসনা মনে পোষণ করে। উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় বাল বিধবা রমণীদের পুনরায় স্বাভাবিক সুন্দর জীবন উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়ার আইন করলেন ঠিকই কিন্তু এই আইনের অপব্যবহার করে অনেকেই বিধবা রমণীদের বিবাহ করে সম্পত্তি হস্তগত করার স্বপ্ন দেখে। ফাঁদে ফেলে তাদের ভোগ করে, কুদৃষ্টি আরোপ করে। বেণীও বিধবা শান্তকে বিবাহ করতে চায় মূলত সম্পত্তির লোভে।

বেণী সহচরীকে দিয়ে শান্তকে, বিবাহে রাজী করানোর কথা বলে। বিধবা শান্তর বৈধব্য আচার পালনের নিষ্ঠা অসীম। স্বামী বিয়োগের পর তেরো বছরের বিধবা শান্ত নিজেকে পুরোটাই মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে। জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়ে শান্ত কঠিন বৈধব্যাচারে মন নিবেশ করেছে। সহচরী জানিয়েছে,—"*তের বছরের মেয়ে বিধবা হলো, গিন্নি হাতের বালা রাখবার জন্য কত বুঝিয়ে ছিলেন, তা বল্লে 'না মা আর কেন', কখনও একখানা ভাল শাদা ধুতি পরলে না, নিরিমিষ তরকারি টরকারি খেতে তো দোষ নাই, তা ঐ হবিষ্যি, দশমীর দিন বই*

একটু দুধ খায় না, শ্বশুরের অত টাকা হাতে পেলে, তা একটু বাবুয়ানা আছে? দাসীদের সঙ্গে মিলে কাজ করে।"[১১২] কিন্তু বেণী শান্তকে ভালোবেসে বিবাহ করতে চায়। সহচরীও বিধবা শান্তর যন্ত্রণাকে সহ্য করতে না পেরে সম্মতি জানায়। মূলত নাট্যকার এ নাটকে বিধবা শান্তর সংকটপূর্ণ দিকটি উন্মোচিত করেছেন সমাজনীতির আড়ালে।

স্বামীর প্রতি শান্তর অবিচল ভক্তি তৎকালীন সমাজের বিধবা রমণীদের মানসিকতাকেই প্রস্ফুটিত করে,—'' *আমি হিন্দুর ঘরের বিধবা, এ দেহখানা যে কি তুচ্ছ তা আমি বেশ বুঝতে পারে; সহমরণ প্রথা নাই নইলে যে দিন পতি মলো সেইদিন হাসতে হাসতে চিতায় গে উঠতে পারতুম; এখনও প্রাণ সেই পতির পায়, শূন্য দেহখানা লয়ে আছি, এর কোন সুখের চিন্তা নাই।*"[১১৩] শান্ত বিধবা রমণীদের পুনরায় বিবাহ হওয়াকে বিশ্বাস করেনা। বিশ্বাস করে যে শ্বশুরবাড়ীর ভাত যে খেয়েছে সেই শ্বশুর বাড়ী কি বদলানো যায় না। শান্তর বিশ্বাস স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামী পরলোকে যায় তখন অন্য আরেক বিবাহ করার পর বিধবা হলে পরলোকে কটা স্বামীর সেবা যে করবে? সাহেবদের মতো গোত্র পরিবর্তন করা হিন্দুর ঘরের মেয়েদের শোভা পায় না, —'' *...প্রথম স্বামী স্ত্রীর ইহ জন্মের সুবাদ নয়, আমি মহাভারতে পড়েছি পরকালেও সেই সুবাদ থাকে। দুদিন বাদে তো মরবো তখন কটা স্বামীর সেবা করবো? তারপর আমি এক সংসার থেকে আর এক সংসারে এসেছি, এক গোত্র থেকে আর এক গোত্রে এসেছি, সাহেবদের মতন আমাদের মাগটী ভাতারটী নয়, শ্বশুরশাশুড়ী ভাশুর দেওর জা ননদ, আমিও তাদের মাঝে একজন বৌ বে দিয়ে এনে হাতের ভাত খেয়ে জাতে নিয়েছে সে ঘর কবার বদলাব?*"[১১৪] শান্ত কোনভাবেই বিবাহ করতে রাজী নয়।

অদ্ভুত এক বিশ্বাস। হিন্দু রমণী তার সারাটা জীবন ধরে কঠিন ব্রত পালনে সম্মত, সমস্ত শখ আহ্লাদ বিসর্জন দিতে সম্মত কিন্তু পুনরায় বিবাহ করতে সক্ষম নয়। তৎকালীন সমাজ বিধবা রমণীদের যৌবন জীবন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানানভাবে তাদের মনকে অবদমিত করেছে। স্বামী দেবতা হয়েছেন—এই ধরণের অনিত্য সত্যকে বিশ্বাস করিয়েছে তৎকালীন সমাজ। শান্তর মত

বহু বিধবা রমণীদের মনের ভিতর দেবতার স্ত্রী রূপী অনিত্য সত্য ঠাঁই নিয়েছে। কৌশলে তাদের সাধ আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে সমাজ। ঠাকুব সেবার কাজে ব্যস্ত করে বাকী জীবনের অনাড়ম্বর করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে তৎকালীন সমাজ।

অমৃতলাল বসুর বিশিষ্ট শোকনাটক *'বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন'।* বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করে এনাটক রচিত। ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ ঘটে। ওই বছর প্রকাশিত হয়, অমৃতলাল বসুর *'বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন'* নাটক। নাটকটিতে বিদ্যাসাগরের সামাজিক কাজকর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন নাট্যকার। ছাব্বিশ পৃষ্ঠার এই ছোটো নাটকে দেখা যায় নিমতলার ঘাটে বিদ্যাসাগরের চিতার অদূরে পাঁচজন নাগরিক উপনীত হয়েছেন। তাঁদের কথোপকথনে বিধবা নারীর সংকটচিত্র উত্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ নাগরিক জানিয়েছে,—*''বিদ্যাসাগর হিন্দু-শাস্ত্র সাগর মন্থন করিয়াই বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন; যে শাস্ত্রকারের মত তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন , তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত নহে;...কিন্তু একথা বোধ হয় যে তাঁহার শত্রুরা ও বলিবে না, যে বিদ্যাসাগর মহাশয় করুণার বশে দৃঢ় বিশ্বাসে ঋষি বাক্যে নির্ভর না করিয়া পাশ্চাত্য প্রথার দৃষ্টান্তে আধুনিক উৎকট সমাজসংস্কারকদের প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া বিধবার বিবাহে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ...সপাদুকা দেবগৃহে উপবেশন করতঃ যবন-জন-প্রিয়-পক্ষী-মাংস সংযোগে ম্লেচ্ছান্ন ভোজন করিয়া বিধবা বিবাহের বিরোধী পরিচয়ে হিন্দু নাম ক্রয় করা অপেক্ষা, বিদ্যাসাগরের ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যপালনাক্ষমা বালিকা বিবাহ দেওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়।"*[১১৫]

সমকালে বিধবার সংকট নিয়ে নাগরিক সমাজ যে ভাববনা পোষণ করতেন তাকেই নাট্যকার অনাবৃত করেছেন এই অংশে। নাটকটিকে বিধবা সংকট চিত্র উপস্থাপিত না হলেও বিধবা অন্তর্বেদনার প্রসঙ্গ এসেছে বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ বার্তার সঙ্গে। নাট্যকার বলতে চাইলেন বিধবার সমব্যাথী আর কেউ রইলেন যে বিধবার স্বপক্ষে কথা বলবেন। বিদ্যাসাগরের মত বিধবার বেদনা দরদ দিয়ে আর কেউ উপলব্ধি করবেন।

১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয় অমৃতলাল বসুর *'বাবু'* নাটক। বাবু নাটকে নাট্যকার ইংরেজি শিক্ষিত বাবু সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন নাট্যকার। *'বাবু'* নাটকে ছোকরাবাবু কন্দর্পকান্ত ও তার মাতামহী আজিমার মধ্য দিয়ে বিধবা সংকট প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত হয়েছে। নির্বোধ কন্দর্পকান্ত তার বৃদ্ধ মাতামহীর বয়সজ্ঞান না করে পঁচিশ বছর বয়েসী এক পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে চায় ।আজিমা হতবাক হয়ে যায় বৃদ্ধ বয়সে বিধবা বিবাহের কথা শুনে,—*''এ কেমন কথা*

কোস্ রে কন্দর্পে? তিনকুরি মোয়া তিন গোন্ডা বয়স অইল আমার; আরাই কুরি বছরের কালে তোর আজা কুঞ্জেও বস্‌ছে, এখন আমার তুলসী তলায় সোমাজ দিলেই অয়,—গউরচন্দ কবে দয়া কর্‌বোন-টানি লবোন, আমি বিয়ে কর্‌বো, এ কেমন কথা কোয়? হিন্দুর গরে রাঁড়ের বিয়ে কি অয়? দর্ম্ম যাবা, দর্ম্ম যাবা।"[১১৬]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যসাগর বাল বিধবা নারীর শারীরিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বিধবা বিবাহের কথা ভেবেছিলেন। তিনি মূলত অক্ষতযোনি বিধবাদের বিয়ের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। এবং যাঁরা যুবতী অবস্থায় বিধবা হয়েছেন তাদের পুনর্বিবাহের কথা বলেছিলেন। *'বাবু'* নাটকে দেখা যায় বিপরীত ছবি। কন্দর্পকান্তি সংস্কারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বৃদ্ধ আজিমাকে পুনর্বিবাহ দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ফলে, সমকালে প্রচলিত বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিপরীতমুখী উপহাসময় বিধবা সংকটের ছবি নাট্যকার *'বাবু'* নাটকে তুলে ধরেছেন।

বস্তুত উনিশ শতকের আলোচ্য নাটকগুলির কেন্দ্রভূমিতে উপস্থাপিত হয়েছে বিধবা নারীর অস্তিত্বের সংকটময় নিদারুণ চিত্র। বৈধব্য কখনো বিধাতার অভিশাপ, কখনো বা সমাজের নিয়ম নিষ্ঠাচারের যূপকাষ্ঠের বলি হয়ে দেখা দিয়েছে বিধবা রমণীর জীবনে। পারিবারিরক অশিক্ষা, সমাজ ভয় এই সংকটকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ঈশ্বরসেবার নামে বাল্য বিধবাদের আচারের গণ্ডীতে বেঁধে ফেলার সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু নারীর স্বাভাবিক যৌনকামনা ধর্মীয় আচারে অবরুদ্ধ থাকেনি। ফলে লুকিয়ে চুরিয়ে প্রণয়, গর্ভপাত ঘটানো, গৃহত্যাগ ও বেশ্যাবৃত্তি গমনের সামাজিক অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করেছে। সমাজ উচ্ছন্নে যাবার দেহাই দিয়ে সমাজপতিরা প্রমাদ গুণেছেন। ভেঙে গেছে সমাজের আচার সর্বস্বতার কঠোরতা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আইন প্রচলনের পর কতিপয় বিধবা বিবাহ সংঘটিত হলেও সেভাবে 'বিধবা বিবাহ' আন্দোলনের চেহারা নিতে পারেনি,—কি সেকালে, কি একালে। বিধবা বিবাহ আন্দোলন কখনোই সার্বিক সাফল্য পায়নি। কারণ এর মূলে কাজ করেছে হিন্দু সমাজের ধর্মীয় মূল্যবোধ, নীতিবোধ, শূচিবায়ুগ্রস্ততা, উদার মানসিকতার অভাব ও পারিবারিক মনোবল যোগানোর শক্তির অভাব। পারিবারিক শিক্ষা, সংস্কার, মন কখনোই বিধবা বিবাহের মত প্রগলিতশীল বিষয়কে আমাদের মনোরাজ্যে অধিষ্ঠিত করে তুলতে পারেনি। ভারতীয় মন প্রকাশ ভীরু। বাঙালিও সেই ভীরুতা বশতঃ নিজ ইচ্ছাকে কখনো মর্যাদা দেয়নি। 'বিধবা বিবাহ আন্দোলন দু-তিন দশকের মধ্যেই বিপথে চালিত হয়েছিল। একদল মানুষ অর্থ রোজগারের পথ হিসাবে দেখেছিলেন কিংবা নারীকে ভোগ করবার এক ভিন্ন পন্থা হিসাবে বিধবা বিবাহে

অগ্রসর হয়েছিলেন। যে বিধবাদের জন্য বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তিত হয়েছিল সে বিধবারাই তাঁরের পারিবারিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কাবের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। ফলে বিধবার সংকট যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছিল।

উনিশ শতকের নাট্যকারের তাঁদের কাহিনীতে বিধবাদের সংকট চিত্র উপস্থাপন অপেক্ষা নারীর অর্থনৈতিক স্বীকৃতি কিংবা শিক্ষাগত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যদি উদ্যোগী হতেন তাহলে বোধ হয় বিধবা বিবাহ আন্দোলন সফলতা লাভ করত বলে আমাদের বিশ্বাস। উনিশ শতকের আলোচ্য নাটকগুলির মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি অন্তঃপুর বিধবা নারীদের অসহায়তার বিচিত্র কাহিনী। বুঝতে পারি, সামজিক সমস্যার কি নিদারুণ অবস্থা ছিল আজ থেকে শতাব্দীকাল পূর্বে। সমাজ ইতিহাসের এই নিদারুণ সত্য অবলোকনের জন্য নাটকগুলির বিষয় ভাব ও কাহিনী আমাদের কাছে পরম আদরের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

সূত্রোল্লেখ উৎস ও টীকা :

১.*কুলীনকুলসর্ব্বস্ব* , রামনারায়ণ তর্করত্ন (শর্ম্মা) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসুর বহুবাজারস্থ ১৮৫ নং ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত, সম্বৎ ১৯১১ [১৮৫৪], পৃ ২৩।

২. *কুলীনকুলসর্ব্বস্ব*, ঐ, পৃ. ২৬।

৩. *কুলীনকুলসর্ব্বস্ব*, ঐ, পৃ. ১০৬।

৪. *কুলীনকুলসর্ব্বস্ব*, ঐ, পৃ. ১০৬।

৫. *কুলীনকুলসর্ব্বস্ব*, ঐ, পৃ. ১০৮।

৬. *কুলীনকুলসর্ব্বস্ব*, ঐ, পৃ. ১০৯।

৭. *কুলীনকুলসর্ব্বস্ব*, ঐ, পৃ. ৫৬-৫৭।

৮. *বাঙ্গালা নাটকের ইতিবৃত্ত*, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, নিউ মদন প্রেস, ৯৫ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা, ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, দোলপূর্ণিমা, ১৩৫৪, পৃ ১৫।

৯. *কুলীনকুলসর্ব্বস্ব*, ঐ, পৃ. ৫৮।

১০. *কুলীনকুলসর্ব্বস্ব*, ঐ, পৃ. ৭৪।

১১. *কুলীনকুলসর্ব্বস্ব* ঐ, পৃ. ৭৪।

১২. *বিধবা বিবাহ নাটক* [১৮৫৬] ,উমেশচন্দ্র মিত্র, বাংলা নাট্যসংকলন ১মখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, সম্পাদনা বিষ্ণু বসু ও নৃপেন্দ্র সাহা, জুন ২০০১, পৃ ১৩৩।

১৩. *বিধবা বিবাহ নাটক*, ঐ পৃ ১৩৪।

১৪. *বিধবা বিবাহ নাটক*, ঐ পৃ ১৩৪।

১৫. *বিধবা বিবাহ নাটক*, ঐ পৃ ১৩৮।

১৬. *বিধবা বিবাহ নাটক*, ঐ পৃ ১৪৫।

১৭. *বিধবা বিবাহ নাটক*, ঐ পৃ ১৪৭।

১৮. *বিধবা বিবাহ নাটক*, ঐ পৃ ১৪৮।

১৯. *বিধবা বিবাহ নাটক*, ঐ পৃ ১৫০।

২০. *বিধবা বিবাহ নাটক*, ঐ পৃ ১৫১।

২১.*বিধবা বিবাহ নাটক*, ঐ পৃ ১৬০।

২২.*বিধবা বিবাহ নাটক*, ঐ পৃ ১৬১।

২৩. *বিধবা বিবাহ নাটক*, ঐ পৃ ১৬৮।

২৪. *বিধবা বিবাহ নাটক*, ঐ পৃ ১৬৯।

২৫. *বিধবা বিবাহ নাটক*, ঐ পৃ ১৭১।

২৬. *বিধবা বিবাহ নাটক*, ঐ পৃ ১৭২।

২৭. *বিধবা বিবাহ নাটক*, ঐ পৃ ১৭২।

২৮. *বিধবা বিবাহ নাটক*, ঐ পৃ ১৭৩।

২৯. *বিধবা বিবাহ নাটক*, ঐ পৃ ১৫৬।

৩০. *সম্বাদ ভাস্কর*, ২১ আগষ্ট ১৮৫৬, *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৮৪০-১৯০৫)* বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত তৃতীয় খণ্ড, বীক্ষণ, ১২/১ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৬০, পৃ১১০।

৩১.*বিধবা মনোরঞ্জন*, মিত্র রাধামাধব মিত্র, প্রথম ভাগ, ১২৬৩ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় ভাগ ১৭৭৯ শকাব্দ কলিকাতা। শ্রীনবীনচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা গরানহাটা স্ট্রীটে পাঁচু দত্তের গলিতে ৯২ নং ভবনে শ্রীসেখ সেরাজ জমাদেরর গৃহে প্রাপ্য, পৃ ৫।

৩২. *বিধবা মনোরঞ্জন*, ঐ পৃ ৫।

৩৩. *বিধবা মনোরঞ্জন*, ঐ পৃ ৪৩।

৩৪. *বিধবা মনোরঞ্জন*, ঐ পৃ ২৫।

৩৫. *সাম্য* (১৮৭৯), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খন্ড, রিফ্লেক্ট

পাবলিকেশন, সম্পাদনা কাঞ্চন বসু, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ ৩৫০।

৩৬. '*বিধবা বিষম বিপদ*' (১৮৫৬), অজ্ঞাতনামা রচিত, পৃ ৯। *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, গোলাম মুরশিদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ ৬৮।

৩৭. *বিধবা বিষম বিপদ*, ঐ পৃ১৭। সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, ঐ পৃ৬৮।

৩৮. *চপলাচিত্তচাপল্য* (১৮৫৭), যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, পৃ ৯। (আখ্যাপত্র বিনষ্ট)

৩৯. *চপলাচিত্তচাপল্য*, ঐ পৃ ১০।

৪০. *চপলাচিত্তচাপল্য*, ঐ পৃ ১১।

৪১. *চপলাচিত্তচাপল্য*, ঐ পৃ ১২।

৪২. *চপলাচিত্তচাপল্য*, ঐ পৃ ১২।

৪৩. *চপলাচিত্তচাপল্য*, ঐ পৃ ১৪।

৪৪. *চপলাচিত্তচাপল্য*, ঐ পৃ ১৬।

৪৫. *চপলাচিত্তচাপল্য*, ঐ পৃ ৪৪।

৪৬. *বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য* (১৮৫০-১৯০০) প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত, সাহিত্যশ্রী, প্রথম সংস্করণ, ৭ই অক্টোবর, ১৯৭৬, পৃ ১৪৯।

৪৭. *রামনবমী*, গুণাভিরাম শর্ম্মা, কলিকাতা দাস এণ্ড সন্স যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত, নং ৪০ সদন বড়াল লেন, ওয়েলিংটন স্ট্রীট ১৮৭০ খৃঃ অব্দ, পৃ ৮৪।

৪৮. *সপত্নী নাটক* (১৮৫৮), (প্রথম ভাগ) তারকচন্দ্র চূড়ামণি, কলিকাতা ভাস্কর যন্ত্রে শ্রীগগনচন্দ্র চক্রবর্ত্তি দ্বারা মুদ্রিত, সংবৎ ১৯১৪, পৃ ৪৫-৪৭।

৪৯. *সপত্নী নাটক*, ঐ পৃ ৯৮-৯৯।

৫০. *বিধবা বিরহ নাটক*, শিমূয়েল পিরবক্স, ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেস, কলকাতা, ১৮৬০, পৃ১৩।

৫১. *বিধবা বিরহ নাটক*, ঐ, পৃ ১৩।

৫২. *বিধবা বিরহ নাটক*, ঐ, পৃ ১৯।

৫৩. *বিধবা বিরহ নাটক*, ঐ, পৃ ২০।

৫৪. *বিধবা বিরহ নাটক*, ঐ, পৃ ১৪।

৫৫. *বিধবা বিরহ নাটক*, ঐ, পৃ ২৪।

৫৬. *বাল্যোদ্বাহ নাটক*, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি, কলিকাতা সূর্য্যোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭২ শকাব্দ, নির্বাচিত প্রহসন উনিশ শতক, সম্পাদনা অলোক রায়, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, মে ২০১৩,পৃ২৯২।

৫৭. *বাল্যোদ্বাহ নাটক*, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি, ঐ, পৃ ৩০৬।

৫৮. *বাল্যোদ্বাহ নাটক*, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি, ঐ, পৃ ৩০০।

৫৯. ভূমিকা অংশ, *ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২)* হরিশ্চন্দ্র মিত্র, নূতন যন্ত্র, ঢাকা (১২৬৯), পৃ৩।

৬০.*ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২)* ঐ, পৃ ৭।

৬১.*ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২)* ঐ, পৃ ৩৩।

৬২.*আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক*(১৮৬২) কুশদেব পাল, ১ম খন্ড ও ২য় খন্ড কলিকাতা শীলএন্ড ব্রাদার্স যন্ত্রে যন্ত্রিত, ১২৬৯ সাল, পৃ ৮০।

৬৩.*আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক*, ঐ পৃ ৯১।

৬৪. *পুনর্বিবাহ নাটক*, গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, কলিকাতা, গৌড়ীয় যন্ত্রে মুদ্রিত, সন ১২৬৯ সাল [১৮৬২] পৃষ্ঠা ৪৩।

৬৫. *বিধবাবিলাস নাটক*, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর ?য়টস ফ্রেণ্ড যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত বেহারিলাল দত্ত দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত, ইংরেজি সন ১৮৬৪। বঙ্গাব্দ ১২৭১। মূল্য দশ আনা, ভূমিকা অংশ, পৃ ৫।

৬৬. *বিধবাবিলাস নাটক*, ঐ, পৃ ৮৫।

৬৭. *বিধবাবিলাস নাটক*, ঐ, পৃ ৪৯।

৬৮. *বিধবাবিলাস নাটক*, ঐ, পৃ ৬০।

৬৮. *বিধবাবিলাস নাটক*, ঐ, পৃ ৬১।

৬৯. *বিধবাবিলাস নাটক*, ঐ, পৃ ৬৩।

৭০. *বিধবাবিলাস নাটক*, ঐ, পৃ ৬৪।

৭১. *নবনাটক*, রামনারায়ণ তর্করত্ন, ১৭৮৮ শকাব্দে বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে স্ট্যানহোপ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানি কর্ত্তৃক এ নাটক মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা, পৃ৭০।

৭২. *নবনাটক*, ঐ, পৃ ৯১

৭৩. *বিয়ে পাগলা বুড়ো*, দীনবন্ধু মিত্র, দীনবন্ধু রচনাবলী, সম্পাদনা অজিত কুমার ঘোষ,

হরফ প্রকাশনী, ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সংস্করণ, পৃ ১১০।

৭৪. *বিয়ে পাগলা বুড়ো,* ঐ, পৃ ১১০।

৭৫. *বিয়ে পাগলা বুড়ো,* ঐ, পৃ ১১১।

৭৬. *বিয়ে পাগলা বুড়ো,* ঐ, পৃ ১১১।

৭৭. *মেঘনাদবধ নাটক,* ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক কালীকুমার চক্রবর্তী, ১৫ নং কলকাতা ঝামাপুকুর, বি.পি.এমস যন্ত্রে ছাপা, ১২৭৪ [১৮৬৭], বঙ্গাব্দের ২৮সে ভাদ্র, মূল্য বারো আনা, পৃ ৩০।

৭৮. *মেঘনাদবধ নাটক,* ঐ পৃ৫৬।

৭৯. *বঙ্গকামিনী নাটক,* হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বি.পি.এমস যন্ত্রে মুদ্রিত শ্রীকালীকুমার চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১৫নং ঝামাপুকুর লেন, ১২৭৫ সাল [১৮৬৮] সালে প্রকাশিত, পৃ পৃ ৫৮।

৮০. *বঙ্গকামিনী নাটক,* পৃ ৭৬।

৮১. *বঙ্গকামিনী নাটক,* পৃ ৯৭।

৮২. *হিন্দু মহিলা নাটক,* বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, ১৮৬৮ সালে কলকাতা 'আমাস্ট্রীট' হতে প্রকাশিত, পৃ ৮।

৮৩. *হিন্দু মহিলা নাটক,* ঐ, পৃ ৩৯।

৮৪. *হিন্দু মহিলা নাটক,* ঐ, পৃ ৭৭।

৮৫. *হিন্দু মহিলা নাটক,* ঐ পৃ ৮৫।

৮৬. *সাক্ষাৎ-দর্পণ* নাটক, অজ্ঞাতনামা রচিত, ১২৭৮ [১৮৭১] বঙ্গাব্দে, ২২১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দ্বৈপায়ণ যন্ত্রে শ্রী যদুনাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত, পৃ ৬৯।

৮৭. *সাক্ষাৎ-দর্পণ* নাটক, ঐ পৃ ৭০।

৮৮. *বিধবার দাঁতে মিশি,* গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা,সূর্যপাড়া লেন, সিমলা, ১৮৭৪, পৃ২৫।

৮৯. *বিধবার দাঁতে মিশি,* পৃ ৫৬।

৯০. *বিধবার দাঁতে মিশি,* পৃ৪৫।

৯১. *শরৎ সরোজিনী,* দুর্গাদাস প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, পটলডাঙ্গা, পটুয়াচোরাবালি, ১১ সংখ্যক ভবনে নূতন ভারতযন্ত্রে শ্রী বামনসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ১২৮৩ [১৮৭৬] সালে, পৃ ৫৫।

৯২. *শরৎ সরোজিনী*, ঐ, পৃ৫৪।

৯৩. *শরৎ সরোজিনী*, ঐ, পৃ১৪।

৯৪. *শরৎ সরোজিনী*, ঐ, পৃ১৫।

৯৫. *শরৎ সরোজিনী*, ঐ, পৃ৪০।

৯৬. *সন্তাপিনী নাটক*, জনৈক ভদ্রমহিলা প্রণীত, বাগবাজার স্মিথ এণ্ড কোং, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, [১৮৭২] মূল্য এক টাকা, পৃ৫৪।

৯৭. *সন্তাপিনী নাটক*, ঐ, পৃ ৫২।

৯৮.*সন্তাপিনী নাটক*, ঐ, পৃ ৫৬।

৯৯. *সন্তাপিনী নাটক*, ঐ, পৃ ৫৫।

১০০. *সন্তাপিনী নাটক*, ঐ, পৃ ৫৮।

১০১. *সন্তাপিনী নাটক*, ঐ, পৃ ৪৮।

১০২. *এমন কর্ম্ম আর করব না*, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালীদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, আষাঢ় ১৭৯৯ শক, মূল্য দশ আনা, পৃষ্ঠা ৭।

১০৩. *এমন কর্ম্ম আর করব না*, ঐ, পৃ ৬।

১০৪. *এমন কর্ম্ম আর করব না*, ঐ, পৃ ৫১।

১০৫.*বঙ্গবিধবা*, বিরজামোহন চৌধুরী, ১৮৮২, পৃ২৫। (আখ্যাপত্র বিনষ্ট হওয়ায় প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা জানা সম্ভবপর হয়নি।)

১০৬. *বিধবা সঙ্কট*, অজ্ঞাতনামা রচিত, কলিকাতা ১৫১ নং বারাণসী ঘোষের স্ট্রীট রিপণ প্রেস এজেন্সী থেকে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৯০ সাল, পৃ ৬৬।

১০৭. *বিধবা সঙ্কট*, ঐ, পৃ ৭০।

১০৮. *তরুবালা*, অমৃতলাল বসু, পৃ ১৪। (আখ্যাপত্র বিনষ্ট হওয়ায় প্রকাশকের নাম জানা যায়নি।)

১০৯. *তরুবালা*, অমৃতলাল বসু, পৃ ৩৫।

১১০. *তরুবালা*, অমৃতলাল বসু, পৃ ৪২।

১১১. *তরুবালা*, অমৃতলাল বসু, পৃ ৪৩।

১১২. *তরুবালা*, অমৃতলাল বসু, পৃ ৭৭।

১১৩. *তরুবালা*, অমৃতলাল বসু, পৃ ১১৫।

১১৪. *তরুবালা*, অমৃতলাল বসু, পৃ ১১৬।

১১৫. *'বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন'*, শ্রী অমৃতলাল বসু প্রণীত ও প্রকাশিত, কলিকাতা ২নং মল্লিক লেন হইতে প্রকাশিত, কলিকাতা, ৬ নং ভীমঘোষ লেন, গ্রেট ইডেন প্রেস ইউ.সি. বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত, সন ১২৯৮ সাল। মূল্য ১০ আনা, পৃ১১।

১১৬. *বাবু*, অমৃতলাল বসু, *অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ প্রহসন*, সম্পাদনা ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পুঁথি প্রকাশনার পক্ষে অমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পি ৪০, ব্লক বি, বাঙুর এভেনিউ, কলকাতা ৫৫, অক্ষয় তৃতীয়া ১৩ মে ১৯৯৪, পৃ ১৯৫।

———